ছোট গল্প : ছোট আয়নায় বড় জীবনের ছবি

গল্পের আয়নায় মানুষের জীবন বিম্বণ আবহমান কালের ঘটনা। জীবনের নিরন্তর এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে গল্পও বিকশিত হয়েছে। দেশে দেশে কালে কালে গল্প কথা এসেছে ভিন্ন রূপে। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের অতৃপ্ত মন জীবনকে মনের মত করে গড়তে চেয়েছে, আর শিল্প সাহিত্যের মাধ্যমে সেই অতৃপ্তি ঘোচানোর চেষ্টা করেছে। গড়ে তুলেছে গল্প। মানব ইতিহাসের একেবারে প্রথম পাতা থেকেই মানুষ গল্প ভাবতে শিখেছে। পরিবেশ, জীবনযাত্রা এবং আনন্দ লাভের প্রয়োজনে সব দেশের মানুষই একভাবে গল্প ভেবেছে। এর প্রথম ধাপে রয়েছে রূপকথা। রূপকথা গুলিতে আদিতম গল্প কল্পনার রেশ রয়ে এসেছে একালেও। তাই রূপকথার গল্প আজকের শিশুদের কাছে অতি প্রিয় বিষয়। রূপকথার পরিপুষ্টি ঘটেছে মানব ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে; যার স্থান এখন শিশুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঐ সমস্ত শিশুপাঠ্য কাহিনির অন্তরালেই মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা সংগুপ্ত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য - "বাস্তব জগতে যে শক্তি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে, যে আদর্শের আমরা সন্ধান করি, রূপকথার রাজ্যেও সেই মানব মনের আদিম, সনাতন নীতিরই আধিপত্য।"[১] - ভারতবর্ষ জাতক, পঞ্চতন্ত্র, বৃহত কথা, দশকুমার চরিত্রের গৌরবিনী জননী। গল্পের এই বীজকোষকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্যপ্ত রূপ দেন রবীন্দ্রনাথ। 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা' প্রাচীন গল্পকথারই একরূপ। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের গল্প হিতবাদী, সাধনা-ভারতী প্রভৃতি পর্বে রূপকথাকে ছাপিয়ে, কল্পনার মায়াজাল অতিক্রম করে বাস্তব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে, তুচ্ছ যাপনের প্রতিটি মুহূর্তকে রূপ দেন। এরপর সবুজপত্র, আরো পরবর্তীকালে তিনসঙ্গী পর্বে রবীন্দ্রনাথ জীবনের ভাষ্য রচনা করলেন, ছোটগল্পের হল পরিপূর্ণ বিকাশ। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই প্রায় রবীন্দ্রপর্বের শেষদিকে বাংলা কথা সাহিত্য যাঁদের দ্বারা শাসিত হয়েছে তাঁরা মূলত কল্লোল গোষ্ঠী নামে পরিচিত। রবীন্দ্র রচনার বিরোধিতা করে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা বাংলা সাহিত্য রচনা করতে শুরু করলেন। বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রবীন্দ্র উত্তর বাংলা ছোটগল্পের কলারূপ নির্মাণ এবং বাস্তবতার এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে বাংলা কথা সাহিত্যকে ঢেলে সাজালেন। এই গোষ্ঠীর লেখকেরা প্রধান দুটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন; প্রবল বিরুদ্ধবাদ এবং বিহুল ভাববিলাস। কল্লোল এর উদ্ভব মধ্যবিত্ত জীবনানুভবের বৃন্তমূলে। ১ম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধের প্রভাবে সমকালীন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে পড়ে মধ্যবিত্ত জীবন শুধুমাত্র হতাশ হয়ে পড়েছে। জীবনে কোথাও কোন আশাবাদিতার সুর শুনতে পারছে না। নাগরিক সভ্যতার এই ভগ্ন দশা কল্লোলের লেখকদের গল্পে স্থায়ী রূপ পেল। কল্লোলের সমান্তরালে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাউকে বিষণ্ণ করে বিগত যুগের বিলীয়মান অস্তরাগ, কারও লেখায় প্রকৃতির

কোলে পুর্নবাসন, আবার কেউ বা পাঠককে পৌছে দেন উত্তরণহীন এক-প্রাগৈতিহাসিক কৃষ্ণ গহ্বরে। বীরভূমের গহন-গ্রামের ভঙ্গুর ভূমিপতি বংশের সন্তান তারাশঙ্করের মেজাজে ও রচনায় স্বভাবতই নতুন জীবন দৃষ্টির সঞ্চার ঘটেছে। জমিদারী প্রথার ভাঙা বনিয়াদের ওপর কম্পমান ব্রাহ্মণ সমাজ, তারই পাশে রাঢ় অঞ্চলের অন্ত্যজ আদিবাসীদের দৃপ্ত জীবনস্রোত। কেবল অভিজ্ঞতা নয়, অন্তরের নিবিড় অন্তরঙ্গতায় তারাশঙ্কর গড়ে তোলেন তাঁর কথা শিল্প। নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রামীন পরিবারের সন্তান বিভূতিভূষণ বাস্তবের ধূলোমাটি ঝরিয়ে দিয়ে গল্পের জীবন কথাকে আকাশচারী করতে চেয়েছিলেন। 'কিন্নরদল', মৌরীফুল, পুঁইমাচা তার উদাহরণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব যেন নতুন কালের, নতুন মেজাজের, গল্প শিল্পের এক ঐতিহাসিক দিগন্ত উন্মোচন। ''নতুন কালের ধসে পড়া মধ্যবিত্ত মানসিকতার উদ্‌বেজনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জর্জর চাপে তাঁর চেতনা বিদ্ধ হয়েছিল''[২]। তাইতো মধ্যবিত্ত জীবনের হাজার ভণ্ডামি, প্রতারণা, ক্রুরতা ও পাশবিকতার ফলে যে জীবনের বিকার তাকে দেখিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতাও ফিরে এসেছে তাঁর গল্পে। সেখানে যুক্ত হয়েছে মার্কসবাদ থেকে প্রাপ্ত গভীর সমাজচেতনা।

সমাজ মনস্কতার গল্পও একটা বাঁক বদল করে। ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করে 'প্রগতি লেখক সংঘ' গড়ে ওঠে ১৯৩৬ সালে। এরপর ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই সময় থেকে প্রগতিচেতনা সমৃদ্ধ ছোটগল্পের ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করল। নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও মন্বন্তর পীড়িত মানুষের চরিত্র এই সময়কার গল্পের সিংহভাগ অধিকার করে রয়েছে। ত্রিশের দশকের স্থিতিস্থাপিত জীবনের বাস্তবরূপ অঙ্কিত হয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখায়। ৪৭ সালের পরে অবশ্য তাঁরও গল্পের বাঁক ফিরল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শহুরে মধ্যবিত্তের আত্মিক অবনমনকে গল্পের বিষয় করলেন। কখনো কখনো তাঁদের গল্প রচনার পদ্ধতিতেও দেখা যায় নতুনত্ব। বয়সে এঁদের থেকে কিছুটা বড় হলেও এঁদের পরে সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন সুবোধ ঘোষ। জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে রসদ সংগ্রহ করে গড়ে উঠেছে তাঁর ছোটগল্পের জগৎ। সুবোধ ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৯৪০ সালে সুবোধ ঘোষের লেখনী-ধারনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় প্রগতিশীল গল্পধারায় এক বহুমূল্য সংযোজন ঘটে গেল। 'ফসিল' গল্পে রিয়ালিজমের নতুন রূপ নিয়ে এলেন তিনি। আদ্যন্ত মুক্ত মনের মানবতাবাদী লেখক সুবোধ ঘোষের প্রথম জীবনে বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল না। তবুও তাঁর বন্ধু মহল ঐ সময়ের প্রগতি মনস্ক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বিশেষ সংযোগই প্রগতিবাদী মহলে তাঁর নাম উচ্চারিত হতে থাকে। অনামী চক্রের আসরের জন্য যে 'অযান্ত্রিক' গল্প লিখলেন সুবোধ ঘোষ, সেটি আনন্দবাজার পত্রিকার ১৯৪০ সালের বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা সংযোজন হল, এটি তাঁর প্রথম ছোটগল্প হয়েও তৎকালের পাঠক মহলে আলোড়ন উঠল। মার্কসবাদী ও ফ্যাসিবাদ

বিরোধী সাহিত্যের পাক্ষিক পত্র'র লেখক তালিকায় সুবোধ ঘোষের নাম ঘোষিত হল। ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রগতিবাদী এবং জাতীয়তাবাদী অকমিউনিস্টদের মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট হলে প্রতিষ্ঠিত হল 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' - এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সুবোধ ঘোষ, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ। সুবোধ ঘোষের সমসময়ে বাংলা ছোটগল্পের আসরে এসেছিলেন - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - কোনও না কোনও অর্থে সমাজ-সচেতন ছিলেন তাঁরা সকলেই। কিন্তু সুবোধ ঘোষ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মর্মে প্রবেশ করে অত্যন্ত সহমর্মিতায় তাঁর কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুললেন নির্যাতিত শ্রেণীর নিপীড়ন ও যন্ত্রণাকে। তাঁর কলমেই রূপ পেল বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতারণার স্বরূপটি। সুবোধ ঘোষ এমনই একজন লেখক যিনি তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের নানা বৈশিষ্ট্যকে, জীবনদৃষ্টির নানা দিক থেকেই ঋণ সংগ্রহ করেছেন কিন্তু পদানুসরণ করেননি কারোরই। Local Color যখন ঐ সময়ের কিছু লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে, যেমন তারাশঙ্করের গল্পে রাঢ়বাংলা, শৈলজানন্দের গল্পে ঝাড়খণ্ড এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে বাংলাদেশের প্রতি আত্মিক অনুভূতির ফসলকে লক্ষ্য করা যায়, সুবোধ ঘোষের গল্পেও ছোটনাগপুর-বিহার সীমান্তের মানুষের জীরনধারার চিত্র চোখে পড়ে। আবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিসর্গ প্রীতির দিকটিও সুবোধ ঘোষের গল্পে ভিন্ন রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে যদিও দুজনের প্রকৃতিকে দেখা আলাদা রকমের। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিকে দেখায় রয়েছে সারল্য, অপাপবিদ্ধতা এবং প্রকৃতিকে দেখার মধ্য দিয়েই শৈশবে ফিরে গিয়েছেন। সুবোধ ঘোষের প্রকৃতিকে দেখা এবং উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তাঁর দেখা প্রকৃতি অনেক বেশী রুক্ষ্ম এবং কঠিন। এই কঠিন রুক্ষ্ম প্রকৃতিই অনেকসময় হয়ে ওঠে এক একটি চরিত্র। তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলি যেন জীবনের এক একটি ভিন্ন দিক। সাধারণ মানুষের তুচ্ছ আচার আচরণ যেমন তাঁর রচনায় ধরা পড়ে তেমনি মধ্যবিত্ত জীবনের প্রেমের প্রাপ্তি কিংবা অপ্রাপ্তি বেশ কিছু গল্পের বিষয়। তাঁর গল্প লেখকের উপলব্ধি, বিশ্বাস, সমাজচেতনা এ সমস্ত কিছুকে একাধারে বহন করে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের স্বাদ নিয়ে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে সুবোধ ঘোষ এলেন বাংলা কথা সাহিত্যে। গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি পরিবর্তিত দেশকালের সংকটকে তুলে ধরার পাশাপাশি সমকালীন আত্মপ্রবঞ্চক মধ্যবিত্ত চরিত্রদের তুলে ধরেছেন। সমাজের অর্ন্তগত যে ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার ছবি তিনি আঁকছেন এরকম ঘটনা নতুন নয়, এর শিকড় অনেক গভীরে। সীমাবদ্ধতা এবং স্ববিরোধ সত্ত্বেও উনিশ শতকে যে নবজাগরণ ঘটেছিল তা সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত হতে পারেনি। শিক্ষিত মানুষেরা এক হৃদয়হীন বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত সেই সময় থেকেই। এই শতকের নবজাগরণ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জাতি বা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সেতুবন্ধ রচনা করতে সক্ষম হয়নি। মধ্যবিত্তের এই হৃদয়হীন বিচ্ছিন্নতা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে প্রথম দেখাতে চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধে। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ঐ নবজাগরণের

প্রাণপুরুষ। রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের শহুরে শিক্ষিত পোস্টমাস্টারকে মনে পড়ে যায়; যিনি তাঁর সংস্কার থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেননি। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশ জমিদার হয়েও সাধারণ মানুষের খুব কাছে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু সেও পারেনি। অন্যদিকে 'গোরা' উপন্যাসের গোরাও তার শিক্ষা-সংস্কার-রুচির খোলস পরিত্যাগ করে এক অখণ্ড ভারতবর্ষ তৈরীর স্বপ্ন দেখেছে। শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে ব্রাহ্মণ শিক্ষিত শ্রীকান্তকে বাউণ্ডুলে ভবঘুরে চরিত্ররূপে তৈরী করেন আর তাই সাহুজী, অন্নদাদিদি, অভয়া এমনকি বর্মার পথে জাহাজের সকল যাত্রীর সঙ্গে শ্রীকান্ত অনায়াসে মিশে যেতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে কল্লোলীয়রা তাঁদের লেখায় মধ্যবিত্তের declassed হওয়ার স্বপ্নকে প্রকাশ করেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরানী', 'পুন্নাম'; শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি এবং অচিন্ত্যকুমার যখন লেখেন 'বেদে' তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজের সাধারণ স্তরের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দিতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত সবার্থে পিছুটানকে হয়তো তারা এড়াতে পারেননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিউনিস্ট পর্বের রচনা 'সোনার চেয়ে দামী' উপন্যাস বা 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পে মধ্যবিত্তের আত্মসর্বস্ব রূপটির চরম প্রকাশ। যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তার শ্রেণীগত চরিত্র ও আত্মসর্বস্বতা সম্পর্কে বহুদিন আগেই সচেতন হয়ে উঠেছে, গল্প উপন্যাসের মোড়কে আত্মসমালোচনা প্রকৃতপক্ষে সেই আত্মগ্লানিরই প্রকাশ। এই আত্মসমালোচনাই তীব্র এবং দ্বিধাহীন রূপ লাভ করে সুবোধ ঘোষের গল্পে। সভ্যশিক্ষিত সমাজের শ্রেণীগত মোহ বা আত্মকেন্দ্রিকতা ও মধ্যবিত্ত সুলভ স্নবারি তাঁর ছিল না বলেই ওপরকার আবরণকে নগ্ন করে, ঐ শ্রেণীর প্রতি শানিত বিদ্রুপে জীবনের সত্যরূপকে তুলে ধরলেন, যে রূপটি এর আগে এত নগ্নভাবে প্রকাশ পায়নি।

'ফসিল' গল্পটিতে মিঃ মুখার্জীর গল্প বলে মধ্যবিত্তের আত্মসংকটকেই তুলে ধরেছেন। কমিউনিস্ট প্রভাবিত পত্রিকা 'অগ্রনী'তে 'ফসিল' গল্পটি প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার প্রাক্-মুহূর্তে ইংরেজ শক্তির ধনতন্ত্রের পাশাপাশি একটি নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়। অর্থাৎ অঞ্চলটি আজও সামন্ততন্ত্রের অধীনে টিকে রয়েছে। তবে সাবেক কালের শ্রী আজ লুপ্ত। অঞ্জনগড়ের পুরনো ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে লেখক বলেন - "কেল্লার ফটকে বুনো হাতীর জীর্ণ কঙ্কালের মতো দুটো মরচে পড়া কামান। তার নলের ভেতর পায়রার দল স্বচ্ছন্দে ডিম পাড়ে; তার ছায়ায় বসে ক্লান্ত কুকুরেরা ঝিমোয়। দপ্তরে দপ্তরে শুধু পাগড়ী আর তরবারির ঘটা; দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটের মত তামা আর লোহার ঢাল।" (শ্রেষ্ঠ গল্প / পৃ. ২৪) - এই স্টেটের সাড়ে আটষট্টি বর্গ মাইল এর সাড়ে টুকুও তারা হিসাবের খাতা থেকে বাদ দিতে পারে না। রাজতন্ত্র এখানে এতই প্রবল যে ক্ষুদ্র বিষয়ে তারা ফৌজদারী মামলা করে। রাজার শাসনে তটস্থ প্রজারা সবসময়ই সন্ত্রস্ত। এরকম অঞ্চলে নতুন ল-এজেন্ট পদাধিকারী আদর্শবাদী মিঃ মুখার্জী আসেন তাঁর দুচোখে গণতন্ত্রের স্বপ্ন নিয়ে - "ছেলেবেলার ইতিহাস পড়া মার্কিনী ডেমোক্রেসীর স্বপ্নটা আজো তার চিন্তার পাকে পাকে জড়িয়ে আছে।" (পৃ. ২৫) — মিঃ মুখার্জী তাঁর সমস্ত প্রতিভাকে উজাড় করে দিয়ে স্টেটের উন্নতি সাধনে

ব্যস্ত, কারণ তিনি আবিষ্কার করেছেন অঞ্জনগড়ের অন্তর্ভৌম সম্পদকে। নতুন করে, নতুন পরিকল্পনায় অঞ্জনগড়ের কৃষিজীবনকে জাগ্রত করে তোলার স্বপ্ন দেখেন। এমন কি তাঁর সে পরিকল্পনা একসময় সার্থক রূপ লাভ করে। আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলেই তাঁকে ভয় পায়, ভক্তি করে। এ অঞ্চলের প্রজারা প্রত্যেকেই তাদের আয়ের অর্ধাংশ রাজাকে দিতে বাধ্য এমনকি বেগার খেটে তারা খনিতেও অভ্র তোলার কাজে নিয়োজিত। অন্যদিকে সিণ্ডিকেটের মালিকেরা তাদের অনেক টাকা রোজগারের স্বপ্ন দেখায়, দুলাল মাহাতো তাদের সংগঠিত করে। দুলাল মাহাতোই যে তাদের সংগঠিত করছে, তাদের শেখাচ্ছে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নেওয়া অন্যায়। দুলাল মাহাতোর এ নেতৃত্ব আর কেউ ধরতে পারে নি, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দুটি চোখ নিয়ে মুখার্জী পেরেছেন দুলাল মাহাতোকে চিনে নিতে। তাই তিনি বলেছেন - ''সব ছেড়ে দিয়ে মাহাতোকে আগে আটকান।'' গিবসন ও ম্যাককেনা যখন মাহাতোকে একরকমভাবে ব্যবহার করার কথা ভাবে তখন মিঃ মুখার্জীর ভাবনা শূন্যে ঘোরাফেরা করে। একসময় তিনি সরে আসতে চান তাঁর দায়িত্ব থেকে। তাঁর অর্ন্তদ্বন্দ্ব প্রকাশ পেতে থাকে - ''পরের রথের সারথ্য আর বোধ হয় চলবে না তার দ্বারা। এইবার রথীর হাতেই তুলে দিতে হবে লাগাম।'' (পৃ. ৩১) - মিঃ মুখার্জী যে ডেমোক্রেসীর স্বপ্নে বিভোর ছিলেন তা যেন ধীরে ধীরে ভেঙ্গে যেতে থাকে। তাই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে তাঁর ভীরু বাঙালী চিত্ত খোলসের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। গল্পকার মুখার্জীর চিত্র অঙ্কন করেন এভাবে - ''শীতের মরা মেঘের মত একটা রিক্ততা, একটা ক্লান্তি যেন মুখার্জীর হাতপায়ের গাঁটগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে।'' (পৃ. ৩২) — তবুও মহারাজের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেন না ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর, ভীরু, বাঙালী মিঃ মুখার্জী। এরপর যখন ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়েছে তখন মুখার্জীর আর কিছু করার নেই। এর মধ্যে দারুণ এক দুর্ঘটনায় প্রচুর শ্রমিক প্রাণ দিলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বি সিণ্ডিকেট ও মহারাজা উভয়ে হাত মিলিয়েছে। মিঃ মুখার্জী চাপা পড়া মৃতদেহগুলিকে প্রত্যক্ষ করে লক্ষ বছর পরের ফসিলকে দেখেছেন, একই সঙ্গে মুখার্জীর নিজের বোধ বুদ্ধিগুলি যেন ফসিলে পরিণত হয়ে গেছে। মুখার্জী ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছেন লক্ষ বছর পর এই মৃতদেহগুলি এক একটি ফসিলে পরিণত হবে যা আবিষ্কার করবেন কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের দল। মনে পড়ে যায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা কবিতাটি -

''তারপর বহু শত যুগ পরে / ভবিষ্যতের কোনো যাদুঘরে /
নৃতত্ত্ববিদ্ হয়রান হয়ে মুছবে কপাল তার,
মজুতদার ও মানুষের হাড়ে মিল খুঁজে পাওয়া ভার।
তেরশো সালের মধ্যবর্তী মালিক, মজুতদার
মানুষ ছিল কি? জবাব মেলে না তার।''[৩]

— আসলে এই সাবহিউম্যান শ্রেণীর মানুষেরা প্রকৃতই আত্মহত্যাপ্রবণ, এই প্রবণতা যেন মুখার্জীর মধ্যেও

প্রবল। তাই ভবিষ্যৎ ভাবতে ভাবতে একসময় মুখার্জী নিজেও ফসিলে পরিণত হয়ে গেছেন, তাঁর চেতনায় বর্তমানের লাল রক্তের দাগ মুছে গিয়ে লক্ষ বছর পরের সাদা ফসিলে জায়গা নিয়েছে। এই দর্শন একভাবে মধ্যবিত্তের পুথিগত বিদ্যারই ফসল।

'গোত্রান্তর' গল্পের নায়ক সঞ্জয়ও মিঃ মুখার্জীর মত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবক। সংসারের প্রত্যেকের স্নেহ যে পণ্যের বিনিময় মাত্র তা সে বুঝে গেছে। আর তাই ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরী পেয়ে সে চলে যায় চুরাশী পরগনার রতনলাল সুগার মিলে, সেখানে সে ক্যাসমুন্সীর পদ লাভ করে। তার সঙ্গে আলাপ হয় নেমিয়ার ও তার বোন রুক্মিনীর। রুক্মিনীর শরীরের প্রতি আকৃষ্ট সঞ্জয়ের গোত্রান্তর হতে শুরু হয়। একদিন যে মধ্যবিত্ত জীবন থেকে বেরিয়ে এসে গোত্রান্তরিত হতে চেয়েছিল সঞ্জয়, সেই আবার তার সমস্ত আদর্শ নীতি ভুলে গিয়ে, নিজের পরিচয় এবং মূল্যবোধ হারিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। এ শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার লোভ। রতনলাল সুগারমিল যেদিন চাষীদের আখের খেত কম দামে কিনে নিতে চায় সেদিন চাষীদেরকে এক আশ্বাসবাণী শোনায় সঞ্জয়, যা তার পুথিগত বিদ্যার ভুল প্রয়োগ, একই সঙ্গে নিজের ঘা খাওয়া অহং চরিতার্থ করার তাগিদ। যখনই তা বিদ্রোহের মোড় নিতে শুরু করেছে, তখন সঞ্জয় ভিতরে ভিতরে ভীত হয়ে উঠেছে। চাষীদের ঘরে খাদ্য নিঃশেষিত, বিকিয়ে যাচ্ছে তাদের যা কিছু পুঁজি, মড়ক লেগেছে পাড়ায় পাড়ায়। আর নেমিয়ার অন্নহীন বস্ত্রহীন হাঘরে নেমিয়ার তাদের সংগঠিত করে চলেছে। সঞ্জয় যেন বিপ্লব বিপ্লব খেলা খেলতে খেলতে একসময় বাস্তবের মুখোমুখি এসে একেবারে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। তার পায়ের নীচের মাটি খুঁজে পাচ্ছে না; অন্যদিকে রুক্মিনীর গর্ভে এসেছে তারই সন্তান, রুক্মিনীর দায়িত্ব এবং সকল চাষীর বাঁচা মরার দায়িত্ব যখন তার কাঁধের ওপর এসে পড়েছে তখনই সঞ্জয়ের মধ্যবিত্তীয় রক্ত সিটিয়ে এসেছে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে পড়ে সঞ্জয়ের মনে হয় তারা যেন সকলে চক্রান্ত করে সঞ্জয়কে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যে 'সুইটহোম'কে ভুলতে গোত্রান্তরের নেশায় মেতেছিল, যেখানে তার অস্তিত্ব পণ্যের বিনিময় মাত্র - নেশা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই হোমের উদ্দেশ্যে পালাতে চেয়েছে সঞ্জয়। তার শিক্ষা-বুদ্ধি ও মধ্যবিত্ত সাবধানী মনোবৃত্তি তাকে নেতা বানায়নি, বানায়নি নেমিয়ারের সমগোত্রীয় মানুষও, তাকে শৃগালের মত ধূর্ত চোর বানিয়েছে। যারা অনায়াসে অকাতরে গৃহস্থের মুর্গী চুরি করে খেতে পারে। মধ্যবিত্তের ভণ্ডামির এই রূপ চোখে পড়ে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' গল্পে। যদিও শৈলজানন্দের বহু পরবর্তীকালে সুবোধ ঘোষ গল্পটি লেখেন, তবু কোথাও যেন 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' গল্পের অজিতকে সঞ্জয়ের মধ্যে আরো একবার খুঁজে পাওয়া যায়। রতনলাল সুগার মিলের ক্যাসমুন্সী সঞ্জয় তার এতদিনকার পুথিগত বিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে নেতা হতে চেয়েছিল। নেমিয়ার কে দেখে তার মনে হয়েছিল লোকটি মেরুদণ্ডহীন, তাই কেন্নোর মত গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে থাকে। তার এই দর্শন একসময়কার গোত্রান্তরিত হবার বাসনা থেকেই উঠে আসে।

নিজেকে তার মনে হয় অত্যন্ত আদর্শবান সুপুরুষ। কিন্তু রোগা কালো মেয়েটির প্রতি আসক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার গোত্রান্তর হয়ে যায়। এ গোত্রান্তর অবশ্য প্রকৃত গোত্রান্তর নয়। কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভণ্ডামির মুখোশ আঁটা সঞ্জয় নিজেই জানে না সে আসলে কোন গোত্রের। নেমিয়ার তথা নিরন্ন কৃষকদের বিপ্লবের স্বপ্ন দেখানো এবং রুক্মিনীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন একই এষণা জাত। কিংবা বলা যায় একই জটিল মনোবৃত্তির দুই ভিন্নমুখী প্রকাশ। তাই রুক্মিনীকেভালোবেসে নয়, তার শরীরী আকর্ষণে সঞ্জয়ের মনে হয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি তার বিদ্রোহের যাত্রা যেন শুরু। কিন্তু সে তার সংস্কার থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেনি। যেমনটা পারেনি অজিত। 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' গল্পে প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত সাধারণ বাঙালী শিক্ষিত যুবকেরা এইভাবেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। যেখান থেকে মুক্তিলাভ তাদের সম্ভব নয়, অথচ জীবন থেকে তারা পালিয়ে বাঁচতে চায়। এই গল্পে ভিখারিনি অতসীর মা ও অতসীর প্রতি এক আকর্ষণ অনুভব করে অজিত। তাদের অবস্থার কারুণ্য থেকে বেকার যুবক অজিত তাদের একটানে বাইরে বের করে আনতে চায়, কিন্তু সমাজের নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধি অতসীর মা যখন তার প্রকৃত চেহারা নিয়ে অজিতের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন তার সামনে বাস্তবের কঠিন ক্রুর রূপটি স্পষ্ট হয়ে যায়। এক সময় অতসী ও তার মা'কে যে দীনতা থেকে মুক্তি দেবার স্বপ্ন দেখেছে অজিত বাস্তবের সংস্পর্শে তার সেই মোহ ভেঙ্গে যায়। মধ্যবিত্তীয় গণ্ডী অতিক্রম করে অজিত খুঁজেছিল মুক্তি, গোত্রান্তরিত হতে চেয়েছিল সঞ্জয়, কিন্তু একসময় দুজনেই পুনরায় শামুকের মত মধ্যবিত্তীয় খোলসের মধ্যেই আটকে পড়ে থাকে।

মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতারণার আরো এক চরম প্রকাশ 'সুন্দরম' গল্পে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী যুবক সুকুমারের ব্রহ্মচর্য পালন গল্পের শুরুতে বর্ণনার অতিরেক মনে হলেও আসলে লেখক তাকে গড়ে তোলেন বিষয়টিকে ভাঙবেন বলেই। গল্পের মূল সমস্যা ঘনীভূত হয়েছে সুকুমারের বিবাহ বিষয়কে কেন্দ্র করে। বহু সাধ্য সাধনার পর সুকুমার বিয়েতে মত দিলেও তার পছন্দসই পাত্রী জোটে না; কারণ সুকুমার বিবাগী পুরুষ। তার চোখ যেন খোঁজে এক বিশুদ্ধ, অনির্বচনীয় সৌন্দর্য। অন্যদিকে কৈলাস ডাক্তার লাশকাটা ঘরের তদন্ত করার সুবাদে নারীর রূপকে দেখেছেন অন্তর থেকে, দেহের আভ্যন্তরীন সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি প্রকৃত রূপের সন্ধান পান; এমনকি সেই রূপকে তিনি দার্শনিক সুলভ ভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেন। তিনি জানেন প্রকৃত সুন্দরের রহস্য। তাঁর কাছে তাই সুন্দর শুধুমাত্র বাহ্যিক বিষয় নয়। সুকুমার কিন্তু পাত্রী নির্বাচনে পিতার মন্তব্যকে গুরুত্ব দেয় না। শেষপর্যন্ত বহুসন্ধানের পর যখন সুকুমারের জন্য পাত্রী জুটল, তখনই ঘটল এক বিপত্তি। কৈলাস ডাক্তারের বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল ভিখারিনি তুলসীকে, যার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন, "দেখবার মত চেহারা এই তুলসীর। বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্ব্বাঙ্গে একটা রূঢ় পরিপুষ্টি কোন ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মত কালিমাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক, মাথার খুলিটা বেটপ টেরে বেঁকে গেছে। চোয়াল জুড়ে জন্তুর মতো একটা হিংসা ফুটে রয়েছে যেন। মুখের

সমস্ত পেশী ভেঙে চুড়ে গেছে ছন্নছাড়া বিক্ষোভে।" (পৃ. ৩৮) মুখে আদর্শের বুলি আউড়ে, ব্রহ্মচর্য পালনের আড়ালে সুকুমারের মনের গভীর প্রদেশে সকলের এমনকি হয়তো বা তার নিজেরও অগোচরে সঞ্চিত ছিল তীব্র অবদমিত বাসনা, তার এক ভয়ঙ্কর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কোনদিন কোন নাটক নভেল না পড়ে, সিনেমা থিয়েটারের সঙ্গে কোনরকম যোগ না রেখে শুধুমাত্র যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেই এতকাল জীবনের সার্থকতা খুঁজেছিল সুকুমার। বিবাহে রাজি হওয়ার পরেও তার জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনে সকলেই রীতিমত পরিশ্রান্ত। একসময় যখন তার মনের মত পাত্রী পাওয়া গেছে সেদিন কিন্তু কৈলাস ডাক্তারের হাতেই সুকুমারের ভণ্ডামির চেহারা উদ্‌ঘাটিত। বাইরে লোক দেখানো রূপময়ী নারীর সন্ধান করলেও সুকুমার আকৃষ্ট হয়েছে তুলসীর শরীরের প্রতি। ব্রহ্মচর্যের নামাবলীর আড়ালে সুকুমার ভোগ করেছে তুলসীর শরীরকে, যার পরিণতি তুলসীর গর্ভে সুকুমারের সন্তান। অথচ সামাজিক কারণেই তুলসীকে সে গ্রহণ করতে পারে না, তাই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণকে লোপাট করে দিতে তুলসীকে সে বিষ খাইয়ে মেরেও ফেলে। যে তুলসীর সামাজিক কোন মর্যাদা নেই সেই রকম হতকুৎসিত একটা মেয়ের শরীরী আকর্ষণের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেবার লজ্জা থেকে নিস্কৃতি পেতেই, ভালো মানুষী মুখোশ এঁটে তুলসীকে সে হত্যা করেছে। মধ্যবিত্ত সমাজের এই ভণ্ডামির চেহারা অপেক্ষাকৃত নীচশ্রেণীর নিতাই ও যদু ডোমের মত লোকেদের নজর এড়ায়নি। শরীরের বাহ্য সৌন্দর্যই নয়, কৈলাস ডাক্তার যখন তুলসীর শবব্যবচ্ছেদ করে আবিষ্কার করেন পৃথিবীর অন্য এক সৌন্দর্য - "মাতৃত্বের রসে উর্ব্বর মানব জাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল আছে শিশু এসিয়া।" (পৃ. ৪৬) - নারীত্বের এই রূপে মোহিত কৈলাস ডাক্তারের বিশ্বাস — "আগামী-কালের কোন প্রেমিক, বুঝবে এ রূপের মর্যাদা। নতুন তাজমহল হয়তো গড়ে উঠবে সেদিন।" (পৃ. ৪৫) - কৈলাস ডাক্তার জানেন না তুলসীর হত্যাকারী কে, বা জেনেও জানেন না। পুত্রের কদাচার সম্পর্কে পিতার অজ্ঞতার এই আড়ালকে মুর্হূতে ছিড়ে ফেলেন লেখক। আচমকা এক সত্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করান আমাদের। যদুর মুখে শোনা যায় চাবুক হাকড়ানো উক্তি - "শালা বুড়ো, নাতির মুখ দেখছে।" (পৃ. ৪৬) - ছদ্ম মুখোশ এঁটে সুকুমার যে সৌন্দর্যের কথা এতকাল বলেছে সেই মুখোশ একটানে খুলে দেন লেখক। তুলসীর প্রতি যে অন্যায়টি ঘটে তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বর্ষপ্রাচীন সামাজিক শোষণের প্রতিরূপ। অসহায়, নিঃসম্বল নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই অত্যাচারের মর্মান্তিক ছবি অগ্রজ লেখক শৈলজানন্দের গল্পেও জীবন্ত হয়ে আছে। 'নারীমেধ' গল্পটি এমনই এক রচনা। গল্পের প্রধান চরিত্র পঞ্চুবাবু তার সুন্দরী স্ত্রী মায়ার সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করেছে। নিঃসন্তানা স্ত্রীকে আদর সোহাগে ভরিয়ে দিলেও একসময় তার অবদমিত কামনা বাসনা বিকৃত রূপ লাভ করে। বাড়ির ঝি ছবির যৌবনের প্রতি তার লালায়িত দৃষ্টি পড়ে। স্ত্রী মায়ার অসুস্থতার সুযোগে সে ভোগ করে ছবির শরীরকে। কিন্তু তাকে সামাজিক মর্যাদা দেবার সাহস বা ক্ষমতা কোনটাই নেই শিক্ষিত যুবক পঞ্চুর। তাই তিল তিল

করে বেড়ে ওঠা ছবির গর্ভের সন্তানসহ ছবিকে হত্যা করে খাদের চানকের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। গভীর খাদের অতল তলে তলিয়ে যায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তীয় যুবকের ভণ্ডামির সমস্ত প্রমাণ। শিক্ষিত ভদ্র রুচির সামাজিক জীবনের সামনে তার ভদ্র সভ্য মুখোশ পরিধান করে ফিরে আসে পুনরায়। যারা এই কুকর্মের সাক্ষী তারা ভয়ে বা লজ্জায় চুপ করে থাকে। এমনকি তার স্ত্রী মায়াও। ঠিক যেমনভাবে তুলসীকে প্রাণ দিতে হয়েছে সুকুমারের হাতের বেলেডোনা মাখানো পাঁউরুটি খেয়ে, সেভাবেই ছবিকে প্রাণ দিতে হয়েছে পঞ্চুর হাতে। দুটি গল্পে দুই নারকীয় হত্যা লীলার মধ্য দিয়ে লেখক মূলত মধ্যবিত্তীয় মানসিকতার ভণ্ডামির ভয়ঙ্কর চেহারা তুলে ধরেছেন।

'গোত্রান্তর' গল্পের সঞ্জয় গোত্রান্তরিত হতে চেয়েছে, 'সুন্দরম' গল্পের সুকুমার ব্রহ্মচর্য পালনের নামে নিজের সঙ্গে যে প্রতারণা করেছে 'তিন অধ্যায়' গল্পেও যুবক শ্রেণীর আত্মপ্রতারণারই নির্মম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তিন অধ্যায় আপাত দৃষ্টিতে অহিভূষণের জীবনের তিনটি অধ্যায় হলেও পরতে পরতে, তিনটি পর্যায়ে তথাকথিত শিক্ষা, রুচি ও সংস্কারের মুখোশ খুলে হৃদয়হীনতা এবং ভণ্ডামিকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন লেখক। নিতান্তই অল্পশিক্ষিত, ফোর্থ ক্লাসের চৌকাঠ অতিক্রম না করা ব্যক্তি অহি একরকম গায়ে পড়ে বন্ধুদের সান্ধ্য আড্ডায় যোগ দেয় এবং অযথা বিশ্রীরকম ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে। জীবিকা অন্বেষণের ব্যর্থতা এবং দারিদ্র্য যখন অহির সংসারকে গ্রাস করে নিচ্ছিল সেই সময় বাইশ টাকা মাইনের চাকরি গ্রহণ করে। স্বল্প মাইনা লাভে তার দুঃখ নেই, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী বা অ্যাসিস্টেন্ট কনজারভেন্সী সুপারভাইজার নাম নিতেও তার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আইনের পক্ষ থেকে বাধা এলে তার পোস্টটি যখন সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নাম ধারণ করতে চলেছে তখনই তার যত আপত্তি। অথচ জীবন ও জীবিকার দায় মেটাতে একসময় নরকের কাছাকাছি চলে যেতে তার বাধে না। এই মোহভঙ্গে তার বন্ধুদেরও দায় আছে। ময়লা ময়দানে, শ্মশানের চিতা গুনতে, এমনকি শহরের গলি ঘুঁজির ময়লার মাঝে এসে সে সাফাইকর্মীর হিসাব রাখে। শৈশবে স্কুল জীবনে এই অহি তার শক্তি ও সাহসের জোরে অন্যান্য বন্ধুদের রিং থেকে বাইরে বের করে দিয়েছে, আজকের বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে অহি - "আমাদের সব অশ্রদ্ধার আঘাত সহ্য করে, সাধ করেই পরাজিত হয়ে আমাদের রিং এর মধ্যে থাকতে চায় অহিভূষণ।" (পৃ. ২১৫) - বন্ধুদের কাছে অহি তার বন্ধুত্বের মর্যাদা পায় না, কারণ মিউনিসিপ্যালিটির চাকরি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার গোত্রান্তর হয়ে গেছে, এখন তার পরিচয় বা designation সে সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার, শুধুমাত্র তার ধোপ দুরস্ত পোশাকের আড়ালে তার বর্তমান গোত্রটি চাপা পড়ে থাকে। বন্ধুদের কাছে তার প্রকৃত পরিচয়টি উন্মুক্ত হলেও বন্ধুদের প্রতিবাদ ও অভিযোগে অহি তার স্পর্ধাকে স্বীকার করে। আর একই সঙ্গে সে জানিয়ে দিয়ে যায় তার বিবাহের খবর। স্কুল শিক্ষকের মেয়েকে অহি বিয়ে করতে চলেছে জেনে তার বন্ধুরা সমাজ রক্ষার পবিত্র ও গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে হঠাৎই সচেতন হয়ে ওঠে। নিজেরা

স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে যে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় তাতে স্কুল শিক্ষকের মেয়ের সঙ্গে অহির বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। সত্য পরিচয় প্রকাশ পেতেই অহি তার ভদ্রবেশ পরিত্যাগ করে নিঃসঙ্কোচে সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের দায়িত্ব পালন করে। আসলে গোত্রান্তর তার হয়েই গেছে- "শ্মশানের চড়ায় নেমে চিতা গুনে আসে, ময়লা ময়দানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রেঞ্চ কাটায়। ড্রেনের পাশে বসে মেরামত তদারক করে। নোংরা খাকি হাফ প্যান্ট পরে ক্লেদাক্ত পৃথিবীর চিহ্নিত পথে আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় অহি।" (পৃ. ২১৯) দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ সন্তান পুলিন বাঁডুয্যে হঠাৎই একদিন পুলিন চামারে পরিণত হয়। পুলিনবাবুর দারিদ্র্যের প্রতি সকলের সমবেদনা থাকলেও দারিদ্র্য ঘোচাতে যে পথ বেছে নিয়েছে সামাজিক বিচারে তা মোটেও সম্মানীয় নয়। শ্রেণীমর্যাদার প্রতীক রূপে তার এবং কর্মচারীদের মাঝে যে রঙিন পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিল, সেই সতর্কতা ঘুচে যায়, দুই এর মাঝের পর্দাটি ক্রমশ সরে যায়। শুধু পুলিনবাবুই নয়, গোত্রান্তরিত হয়েছে তার মেয়ে বন্দনাও। নার্সদের সহকারিনী অর্থাৎ জমাদারনীর কাজ করে বন্দনা। তাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের রুচি তাকে সহজেই অবহেলা করে। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর উন্নাসিকতা ও মর্যাদাবোধ গল্পের পরিণতিতে চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত হয়। শিক্ষিত সমাজের বাইরে এসে একসময় গোত্রান্তরিত হয়ে যাওয়া অহি ও বন্দনার বিবাহ সম্পন্ন হয়। মেকী মর্যাদাবোধের ওপর বড় একটি শোধ নিতেই যেন এই বিবাহ ঘটানো হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কুলগৌরব, বংশ গরিমা সমস্তকে মিথ্যে করে দিয়ে অহি বন্দনা জীবনকে নতুন করে খুঁজে পেল, এবং সেইদিনই বারীনদের মিথ্যে অহংকারের মুখোশটি খুলে পড়ল। সমাজের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী তাদের পুথিগত শিক্ষার আবরণটুকুকেই একসময় নিজেদের প্রকৃত রূপ বলে ভুল করেছিল, সেই ভুলটি ধরিয়ে দেয় অহি-বন্দনা। পরবর্তীকালে পঞ্চাশের দশকের গল্পকার বিমল করের লেখা 'বরফ সাহেবের মেয়ে' গল্পের বিষয়বস্তুও 'তিন অধ্যায়' গল্পের সঙ্গে মিলে যায়। বরফসাহেবের মেয়ে জিনিয়া বা জিনি তার শিক্ষিত তিন বন্ধুর কাছে নষ্টা মেয়ে। সামাজিকতার অনুশাসনকে ডিঙ্গিয়ে তিন বন্ধু যখন জিনিকে লাভ করতে অক্ষম, জিনি তখন নন্দকে গ্রহণ করেছে, এমনকি মুখোশধারী ভদ্র সমাজের প্রতি তার স্পষ্ট জবাব - "ভদ্র সমাজে জায়গা তো আমারও নেই।" মর‍্যাল রেসপনসিবিলিটির নাম করে যেসব শিক্ষিত শ্রেণীর দল মাথা ঘামিয়েছে, বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের সম্পর্কের মাঝে, তারা নিজেরাও জানে যে তথাকথিত সংস্কার এবং সামাজিকতা কত ঠুনকো। তাই তারা আজ পরাজিত, তাই তারা লুকিয়ে আসে বন্দনা বা জিনিয়াদের বিবাহ বাসরে। যে নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে তারা এক সময় অহিভূষণ বা নন্দকে নিজেদের সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, তারাই আবার নতশিরে পিছন দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছে জীবনের সার্থকতাকে। বারীন, ভবানী, সতু, শশীর মত বীরু, পাঁচু এবং তিনুও পরাজয় স্বীকার করেছে। অহি-বন্দনা বা জিনি-নন্দের জয়ের মধ্যদিয়ে মধ্যবিত্তের হৃদয়হীন বিচ্ছিন্নতারই পরিচয় দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ।

স্বার্থপর সমাজ প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিতে, বিলোপ করে দিতেও পিছপা হয় না। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পটি এমনই একটি গল্পটি। নয়াবাদ নামক বর্তমান মহকুমার সঙ্গে, তার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ধনিয়ার নাম। বছরের পর বছরের পরিবর্তনশীলতায় সবচেয়ে বেশী যার পরিবর্তন এসেছে সে হল ধনিয়া। যে কোন জনপদের অজস্র পুরুষের ঘর্মমোচনের প্রয়োজনে ধনিয়াদের আবির্ভাব। একসময় ভদ্র পাড়ার কোল ঘেঁষেই স্থান হয়েছিল ধনিয়ার। লোকালয় জনসমাগম এবং পরিবার বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ধনিয়াকে এক অন্যভূমিকায় দেখা যায়। ক্ষুদ্র বিবর্ণ মানুষের শাবককে জন্ম দিতেই বারংবার সে মিশন জেনানা হাসপাতালে আসে। সন্তানের জন্মের পর একদিন একাই ধনিয়া তার 'ছাগল লজে' ফিরে আসে। তার ছোট্ট খাপরার ছাউনির সামনে একটি ছাগল বাধা থাকে বলেই স্কুলের ছেলেরা তার বাড়ির নাম দিয়েছে 'ছাগল লজ'। ধনিয়ার অদ্ভুদ এই মনস্তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হাসপাতালের নার্স বলে ওঠেন, "জীসস্ আমি সত্যি ঘাবড়ে গেছি। এই মেয়েটা আমার বাইবেল ও বিজ্ঞান উল্টে দিয়েছে। জানতাম পাখির বাচ্চাই বড় হয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম পাখিই পালিয়ে যাচ্ছে বাচ্চা ফেলে।" (পৃ. ৫৯) জনসমাগমের সঙ্গে সঙ্গে নয়াবাদের ধনিয়াকে ভিন্ন এক ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়, সে পরিচিত হয় 'দুধমা' হিসেবে। যেসব শিশুর মায়েরা তাদের বাচ্চাদের দুধ যোগান দিতে পারে না, সেইসব ভদ্রবাড়ির আঁতুড় ও অন্তঃপুরে ডাক পড়ে ধনিয়ার। দু'বেলার রেট মাসিক ছ'টাকা হিসাবে বরাদ্দ আদায় করে সেসব বাড়িথেকে বিদায় নেয়। প্রসাধনের চাইতে পরিচ্ছন্নতার জোয়ার তুলে রোজকার নিয়মে সুশ্রী চেহারার ধনিয়া বেরিয়ে পড়ে, কখনো কখনো তারই মাঝে লক্ষ্য করা যায় নিজের সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে ধনিয়ার গৌরব। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে এই গৌরবকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে আসে বাচ্চাদের খাবার, যা টিনের বাক্সে বন্দী হয়ে বিদেশ থেকে সেইসময় সাধারণ গৃহস্থের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছে। এই আগমনে ধনিয়ার শরীরে রীতিমত শিহরণ জেগে ওঠে। নিরন্তর দুধের জোগান দিতে ধনিয়াকে নিরন্তর গর্ভবতী থাকতে হয়। রাতের অন্ধকারের আনাচে কানাচে কে বা কারা আসে তার খবর কেউ রাখে না। কেবলমাত্র ধনিয়ার পিতৃপরিচয়হীন সন্তানেরা বেড়ে ওঠে খৃষ্টান অনাথালয়ে। দূর থেকে সেইসব সন্তানদের দেখে ধনিয়ার মাতৃত্ব জেগে ওঠে, মুগ্ধ হয়ে ওঠে ধনিয়া। মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা তার রয়েছে কিন্তু তারই কারণে সন্তানেরা উঞ্ছবৃত্তি করবে এ কষ্ট থেকে পরিত্রান করতে ধনিয়া তার সন্তানদের দূরে সরিয়ে রাখে। মিশনারী অনাথালয়ের শিশুরা ব্যান্ড বাজিয়ে যখন তার সামনে দিয়ে নেচে বেড়ায় তখন দূর থেকে ছেলেদের দেখে ধনিয়ার চোখের দৃষ্টি "অদৃশ্য চুম্বনের মত প্রত্যেকটি ছেলের মুখের ওপর ছোঁ মেরে ফিরছে। এর মধ্যে অন্তত ছ'টি তারই উপহার। কিন্তু কে তারা চেনবার উপায় নেই।" (পৃ. ৬৫) অগাধ এক ক্লান্তি ও পুলকের বন্যা তার সমস্ত শরীর ছাপিয়ে বয়ে চলেছে। তবুও তার গোপন অব্যক্ত বেদনার মত মাতৃত্বের খোঁজ কেউ রাখে না। নয়াবাদের মানুষগুলির কাছে ধনিয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতেই

চক্রান্ত চলে ধনিয়াকে ভদ্রপল্লী থেকে সরিয়ে দেবার। দুধমার চাইতে বহুভোগ্যা রমনীর পরিচয়টাই তখন বড় হয়ে ওঠে। গণিকাবৃত্তি করে ধনিয়া এই আতঙ্কে ছেলেদের মায়েরা আতঙ্কিত; কিন্তু তারা একবারও বিচার করে না, যেসব সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কা করে ধনিয়াকে নির্বাসন দেওয়া হচ্ছে একদিন তারই স্তনদুগ্ধে সেই ছেলেরা পুষ্ট হয়েছে। ফিরে এসেছে মৃত্যুর মুখ থেকে। যারা ধনিয়াকে দুধমা বলে ডেকেছে সেইসব শিশুরা কেউ কিশোর, কেউ যুবক; চল্লিশোর্ধ ধনিয়ার আজও অপ্রতিরোধ্য যৌবনের আকর্ষণ থেকে তাদের বাঁচাতে তৎপর হয় অভিভাবকেরা। আমড়াতলার সংসার থেকে ধনিয়াকে উচ্ছেদ করে চকবাজারের বেসাতিনীদের মাঝে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। তাই যাবার আগে শেষবারের মত দুদিনের ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ প্রসাদীকে বুকে চেপে আরো একবার মাতৃত্বের আস্বাদ পেতে চেয়েছে ধনিয়া। তার পীনপয়োধর উপচে উঠেছে উচ্ছ্বলিত অমৃতধারায়। যে মাতৃত্বের রূপ নিয়ে ধনিয়া চল্লিশ বছর টিকে আছে আজ তাকে শুধুই দেহবেসাতিনীর পরিচয় নিতে হয়েছে। নিজের প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতেই সমাজ ধনিয়াকে দেয় নির্দয় নির্বাসন। সমাজের ওপর তীব্র এক চাবুক মারার প্রয়োজনেই সুবোধ ঘোষ পরশুরামের কুঠারের প্রতীককে ব্যবহার করেছেন। চল্লিশ বছরের রোদে পোড়া জলে ভেজা যৌবনকে ধারালো অস্ত্রের মত শানিয়ে তুলেছে ধনিয়া। ভদ্র পাড়া ছেড়ে তাকে উঠে আসতে হয়েছে বাজারের গণিকা মহল্লায়। তাই রাস্তায় জমায়েত লুব্ধ দৃষ্টির পেছনে মানুষ গুলিকেও চিনে নিতে ভুল হয় না তার। একদিন যাদেরকে সুধা সিঞ্চনে প্রাণ দিতে হয়েছে, গর্ভধারিনীর বিকল্প হিসাবে ধনিয়ার স্তন্যপানে প্রাণ পেয়েছে যারা, এবারে ধনিয়া তাদের কাছে এসেছে সুধা নয় গরল নিয়ে। সর্বনাশের অতলে তলিয়ে দিতেই সে যেন আজ অসম্বৃতা রঙীন মূর্তি হয়ে জনতার সামনে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। পুরাণে আছে, ধরিত্রীকে ক্ষত্রিয়দের হাত থেকে বাঁচাতে ক্রোধী, দাম্ভিক এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের নিধন করেন। ২১ বার ক্ষত্রিয় নিধন করে পৃথিবীকে প্রায় নিঃক্ষত্রিয় করে তোলেন। পরশুরামের মতই প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে ভদ্রকুলতিলকদের সর্বনাশের চরম সীমায় পৌছে দিতে ধনিয়া তার যৌবনের শানিত কুঠারে বিদ্ধ করে সেইসব মুখোশধারী ভদ্রলোকেদের। মাতৃত্বের গৌরবকে একরকম জোর করে বাক্‌রুদ্ধ করে দিয়ে যে ভদ্র মুখোশধারী লোকেরা আজ তাকে চকবাজারের বেসাতিনী হিসাবে চিহ্নিত করেছে সেখান থেকে ধনিয়ার মুক্তি নেই জেনেই প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে শুদ্ধ হয়ে আজ সে তার যৌবন-কুঠারকে কাজে লাগিয়েছে; তাই গল্পের শেষে তার সর্বাঙ্গে বিদঘুটে আনন্দের জ্বালা উঠেছে। তবুও "প্রতীক্ষায় শান্ত হয়ে থাকে। সে আজ দাঁড়িয়ে থাকবে মাঝরাতি পর্যন্ত, শেষরাতি পর্যন্ত - যতক্ষণ না তার নতুন জীবনের প্রথম বাবু দোরে এসে কড়া নাড়বে, তার নতুন নাম ধরে ডাকবে।"(পৃ. ৬৮) — নির্মম স্বার্থপর সমাজই আরও এক প্রতিহিংসাপরায়ণ পরশুরামের জন্ম দিল। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য মেলে মহাশ্বেতাদেবীর 'স্তনদায়িনী' গল্পের। সুবোধ-ঘোষ তাঁর কাহিনীর সমাপ্তিতে মাতৃত্বের অবমাননা ও তারই ফলে প্রতিশোধ পরায়ণ ধনিয়ার হাতে অস্ত্র বা যৌবনশানিত কুঠার তুলে দেন। এ

প্রতিবাদ মূলত সমাজের বিরুদ্ধে সুবোধ ঘোষের নিজস্ব প্রতিবাদ। অন্যদিকে যশোদার ক্রমপরিণতি ও অসহায় আর্ত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা দেবী দেখাতে চেয়েছেন যশোদা স্বয়ং বসুন্ধরা। বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর প্রভাবে বসুন্ধরা আজ ধ্বস্ত, নগ্ন এবং রক্তাক্ত। যশোদার পরিণতিতে আরো একবার মনে পড়ে যায় "পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন।" 'স্তনদায়িনী' গল্পেও একটি Myth বা পুরাণ প্রসঙ্গ রয়েছে। পুরাণে নন্দের স্ত্রী যশোদা, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কৃষ্ণকে তাঁর স্তন্যে পালন করেছিলেন। তিনি গর্ভধারিনী না হয়েও কৃষ্ণের জননী। তাঁর পালিত পুত্র কৃষ্ণই হলেন সমস্ত মহাভারতের নিয়ন্তা শক্তি, যাঁকে সকলে ভগবান রূপে পূজা করে, সেই সূত্রে যশোদাও হলেন ঈশ্বর স্বরূপিনী। 'স্তনদায়িনী' গল্পে কাঙালীচরনের স্ত্রী যশোদা 'প্রফেশনাল মাদার' বা 'দুধমা' হিসাবে পরিচিত। হালদার বাড়ির কর্তা ও গিন্নি নিজেদের কুকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে এবং ব্রহ্মহত্যার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে কাঙালীচরনকে বাড়ির সামনে দোকান করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। হালদার কর্তার আকস্মিক মৃত্যু এই সম্ভাব্য ঘটনাটিকে সম্ভব হতে দেয় না। কিন্তু কাঙালীচরনের স্ত্রী যশোদা হালদারগিন্নির কাছে আশ্রয় পায়। যেদিন যশোদা হালদার গিন্নির দ্বারস্থ হয় গিন্নি তার কোলে ছ'মাসের নাতিকে ফেলে দিয়ে বলে ওঠে — "মা আমার ভগবান হইয়া আসছ! এ্যারে দুধ দাও মা, পা-ধরি।" — যশোদা সেদিন থেকে দুধমা নামে পরিচিত হল। এইপদে নিযুক্তির ফলে তার প্রতি সকলের ভক্তিভাব অত্যন্ত প্রখর হয়। যশোদা নিজের জীবনকে বিপন্ন করে হালদার বাড়ির কচিকাঁচাদের দুধ জোগান দিতে থাকে। এই পেশায় ছেদ পড়ে গিন্নিমার মৃত্যুতে। সেদিন প্রফেশনাল মাদার পরিণত হল রাঁধুনিতে। হালদার বাড়ির ছেলেদের মানুষ করে তুলতে যশোদার স্তনে ক্যানসার হয়, কিন্তু সেদিন ঐ সব সন্তানেরা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। বহু প্রসবিনী যশোদার কাঙ্ক্ষিত মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেল না সমাজের কাছে। অথচ যশোদা কখনো কখনো সাভিমানে বিড় বিড় করে বলে ওঠে — "দুধ খেয়ে এত বড়টা হলে, এখন এমন কষ্ট দিচ্ছ?" — নিজেকে নিঃস্ব করে দিয়ে, উজাড় করে দিয়ে সে শুধু সন্তান পালন করেছে। কিন্তু যখন সে মৃত্যুমুখে পতিত তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি বা ঐ সমাজ বসুন্ধরার ক্ষতের নগ্নরূপ দেখেও, যশোদার যন্ত্রণাকে সমানভাবে উপেক্ষা করেছে। এও একভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভন্ড বা বিকৃত রূপ।

জীবনের বহু বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা থেকে সুবোধ ঘোষ উপলব্ধি করেছেন মধ্যবিত্তের ভন্ডামি। এমনকি ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালেও সে প্রবঞ্চনার রূপ চোখে পড়ে। প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে পাঠানদের বিরুদ্ধে বাবর জিতেছিলেন রাজপুত ও অন্যান্যরা নিরপেক্ষ থাকায়। দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে আকবর জিতেছিলেন পাঠানদের বিরুদ্ধে ভারতের অন্যান্য শক্তিগুলি নিরপেক্ষ থাকায়। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধেও হিন্দু ও রাজপুতরা নিরপেক্ষ থেকে জাগ্রত মারাঠা শক্তিকে পরাজিত করে। চতুর্থবার পাণিপথের প্রান্তরে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, ইতিহাসের উপরিতলে ঠাঁই পায়নি সেই যুদ্ধ, কিন্তু তবুও সেই যুদ্ধেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল স্টীফানদের ভাগ্য। বাঙালীরা নিরপেক্ষ থেকে মুণ্ডা জাতির পরাজয়কে দ্রুততর করে

তুলেছিল। 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পে বাঙালী দারোগার উপলব্ধিতে জাগ্রত হয় সেই সত্য — "আমরাই নিরপেক্ষ থেকে চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে স্টীফানদের হারিয়ে ছিলাম।" (পৃ. ২১১) - গল্পকথক বাঙালী দারোগা কয়েকজন বীরসাইট মুণ্ডাকে বন্দী করে নিয়ে এলে তাদের মধ্যে একজনকে দেখে চমকে ওঠে, চমকে যায় তার চেহারার দিকে তাকিয়ে - "তার মাথার চুলের জংলী খোঁপাটাও জটার চূড়ার মত হয়ে গেছে। গলায় একটা ভেলাফলের মালা, আদুড়গা, কোমরে ছোট একটি কাপড় জড়ানো। হাতে একটা কাঁসার বালা। এই প্রাগৈতিহাসিক সজ্জার মধ্যে শুধু একজোড়া সুশানিত আধুনিক চোখ .....।" (পৃ. ২১০ - ১১) এই বন্দী নিজেকে পরিচয় দেয় রুন্নু হোরো নামে, কিন্তু আটবছর আগে দারোগা তাকে চিনত স্টীফান নামে। যখন তারা ছিল সমগোত্রীয়, একই মিশনারী স্কুলের ছাত্র। আজ তাদের স্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে। বাঙালী বন্ধুটি হয়েছে দারোগা এবং স্টীফান হয়েছে বীরসাইট, যে অরণ্য অধিকারের স্বপ্ন দেখে। বীরসা ভগবানের শিষ্য বীরসাইট স্টীফান পথ খুঁজে বেড়িয়েছে বিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকেই, আজ সে পথ পেয়েছে। বীরসার জীবনের মধ্যে নিজের জীবনের মিল পায় সে। মুণ্ডা জাতির প্রতি, অরণ্যের প্রতি অত্যাচার চলেছিল বহুদিন থেকেই, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলেছিল অন্তসলিলা ধারায়। সেই বিদ্রোহের পথ চিনেছে স্টীফান আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে। ছাত্রজীবনেই স্টীফান নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে নানাভাবে। তাই সে কখনো ইংরেজী বিষয়ে সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে সকলের ঈর্ষার পাত্র হয়, কখনো সংস্কৃতে, আবার কখনো বা খেলার মাঠে হকি স্টীক ছাড়াই শুধু পা দিয়ে খেলে নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করে। অর্থাৎ অর্জিত জ্ঞান এবং রক্তের উত্তরাধিকারে পাওয়া শারীরিক ক্ষমতা এই দুই এর সম্মেলনে সমবয়সী বাঙালী ছাত্রদের ছাপিয়ে যায় স্টীফান। স্টীফানের এই কৃতিত্বে বাঙালী ছেলেরা অপমানিত বোধ করে। অন্যদিকে স্টীফানকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে নিলে ফাদার লিন্ডনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয় বুড়ো সোখা। পাদ্রীরা তাদের ছেলেদের ধর্মান্তরিত করবে এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না মুণ্ডা বুড়ো সোখা। তার স্বপ্ন এই দুর্গ থেকে ছেলেদের ফিরিয়ে নেবে অরণ্যের বুকে, যেখানে তাদের প্রকৃত শিকড়টি গেথে আছে। ফাদার লিণ্ডনের সঙ্গে বুড়ো সোখার এই লড়াই বিংশ শতক বনাম প্রাক ইতিহাস এর লড়াই। মিশনারিদের সমাজসেবার নামে ধর্মান্তরিত করা এবং আদিবাসী ছেলেদের নিজেদের আয়ত্তাধীন করে তোলা আগ্রাসনেরই নামান্তর। সুতরাং আরণ্যক মানুষদের এই লড়াই আত্মপরিচয় রক্ষার লড়াই, যার অপর নাম স্বাধীনতা। বিদ্যালয়ের ছেলেরা যাকে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ নাম দিয়েছে। এরই জেরে একদিন মাটির গীর্জা ভেঙে দেওয়া হল, পরিণামে বুড়ো সোখার হয় যাবজ্জীবন দীপান্তর। সমস্ত কিছুকেই নীরবে দেখে যায় স্টীফান। ঝড় বইতে থাকে তার রক্তের মধ্যে। এরপর ভারতবর্ষে যেদিন নন্-কো-অপারেশন আন্দোলন শুরু হল সেদিন বাঙালীরা প্রত্যাশা করেছিল স্টীফান নিশ্চয়ই তাদের দলে যোগ দেবে, কিন্তু সেদিনও স্টীফানের নীরবতায় বাঙালীরা তাকে 'পাদরীদের ক্রীতদাস, মনুষ্যত্বহীন, মর্যাদাশূন্য, মুর্খজংলী হোরো' নামে চিহ্নিত

করে। আসলে তারা বুঝতে পারেনি, সেদিন স্টীফানের মধ্যে চলছিল এক খোঁজ, কোনটি তার নিজের লড়াই তার জন্য খোঁজ। সে ততদিনে চিনতে শুরু করেছে মিশনারিদের বদান্যতার আড়ালে লুকোনো থাবাকে। অন্যদিকে বাঙালীদের আত্মসর্বস্ব স্বজন পোষণও তার আর অজানা নয়। সবচাইতে বড় কথা যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় এই আন্দোলন, সেই ভারতবর্ষ তার দেশ নয়। অথচ ফাদার লিণ্ডনের ডাকেও স্টীফান থেকেছে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্টীফানের উদাসীনতা খ্রীষ্টান ফাদার লিণ্ডনকে আহত করে। চিন্তিত ফাদার লিণ্ডনের অভিযান আরো বিস্তৃত রূপ লাভ করে। সবসময়ই তিনি স্টীফানকে নজরে রাখেন। যদি স্টীফান আবার জংলী হয়ে যায়। ধর্মযোদ্ধা ফাদার লিণ্ডন তাই স্টীফানের বাঁশীটিকেও ভেঙে ফেলেন, যে বাঁশীর সুরে স্টীফান তার মনের সমস্ত যন্ত্রণা, আশা এবং স্বপ্নের গান গায়। যে বাঁশীর সুরে চিরকী মুরমুকে প্রাণের কথা শোনায়। মুণ্ডা মেয়ে চিরকীকে ভালোবাসে স্টীফান। ভীত সন্ত্রস্ত ফাদার লিণ্ডন তাই তার প্রথম অভিযান শুরু করেছে মুরমুদের ডিহিতে। অরণ্যের সন্তানকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে। বুড়ো সোখার দীপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে স্টীফান তার অস্তিত্বের সংকট ও তার অরণ্যের যন্ত্রণাকে অনুভব করে। মুণ্ডা জাতির নেতা বীরসাও একদিন শুনতে পেয়েছিল অরণ্যের কাতর আর্তি। বীরসাও এদিন চাইবাসার খ্রীষ্টান মিশনারিতে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে মিশনারির শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছিল। সেখানে সে ডঃ নট্রোট এর সমালোচনা করায় মিশনারি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্ষীপ্ত বীরসার জীবনের turning point এটি। তখন থেকে সে 'anti-missionary and anti-Government' হয়ে উঠে। চাইবাসা থেকে ফিরে এসে বীরসা অনুভব করে তার জাতিকে নতুন ধর্মে দীক্ষিত করতে হবে। মুণ্ডা জাতিকে সে শোনাল এক নতুন বাণী "সিংবোঙা তার জাতির মুক্তির জন্য তাকে পাঠিয়েছেন।" [৪] শত শত মুণ্ডা বীরসার অনুগত শিষ্য হল। তারা মহাজন-জমিদার ও ইংরেজ এই সমস্ত দিকুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কারণ দিকুরা তাদের আদিম অরণ্যকে নষ্ট করে দিচ্ছে। অরণ্যের সন্তান বীরসা সেদিন অরণ্যের আর্ত চীৎকার শুনতে পায়, জননীকে শুদ্ধ করে, তার মর্যাদাকে ফিরিয়ে দিতে, স্বাধীন অরণ্যের স্বপ্নে মুণ্ডা জাতিকে আহ্বান জানালে শত শত মুণ্ডা তার পথে এগিয়ে যায়, তারা হয়ে যায় বীরসাইট। বীরসা ভগবান এবং তার শিষ্য বীরসাইটদের প্রকৃত অস্তিত্বের সংকট মহাশ্বেতা দেবীর দুটি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। 'অরণ্যের অধিকার' ও 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' — দুটি উপন্যাসে মুণ্ডা নেতা বীরসার ইতিহাস, মুণ্ডা জাতির ইতিহাস ঠাঁই পেয়েছে। কালের দিক থেকে সুবোধ ঘোষের লেখা 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পটি আগে লেখা হলেও বিষয়গত দিক থেকে বলা যায় গল্পটি উপন্যাস দুটির পরবর্তী অধ্যায়।

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের নায়ক বীরসা মুণ্ডাও দিকুদের কাছ থেকে অরণ্যকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সুরেশ সিংহের দেওয়া ঐতিহাসিক তথ্য এরকম — "The Zamindars (Rajas) are snatching at the Land and trying to possess it." [৫] (163 page) এদেশের যে

সামাজিক ও অর্থনীতিক পটভূমিকায় বীরসার বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান তা কেবলমাত্র বিদেশী সরকারের শোষণের বিরুদ্ধে নয়, একই সঙ্গে এ বিদ্রোহ সমকালীন ফিউডাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও। কিন্তু "জীবন, বিদ্রোহ, যা কিছু চলমান তার সত্যতা কোন্ কালে কোন দেশে নেতার মৃত্যুতে শেষ হয় না। কালে কালান্তরে উত্তরাধিকারের ধারাপথে অব্যাহত থাকে তার অগ্রগতি। বিদ্রোহ থেকে জন্ম নেয় বিপ্লব।" [৬] — এই উপন্যাসের সমাপ্তি তাই বীরসার মৃত্যুতে হলেও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতে শোনা যায় — "উলগুলানের শেষ নাই! ভগবানের মরণ নাই।" বীরসাও একদিন খ্রীষ্টান হয়ে মিশনারিতে যায়। কিন্তু সেখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হলে ফিরে এসে বীরসা শুনতে পায় জননী অরণ্যের আর্ত চীৎকার — "মোরে বাঁচা বীরসা। আমি শুদ্ধ শুচি নিস্কলঙ্ক হব। ... মোর কান্না কেউ শুনে না। ... তো হতে সকল মুণ্ডা সুখ পাবে।" [৭] সেই থেকেই বীরসা ধরতি আবা বা ভগবান হয়ে মুণ্ডাদের দুঃখ ঘোচানোর দায়িত্ব নিল। তারই নেতৃত্বে একসময় মুণ্ডা গ্রাম বিদ্রোহী হয়ে উঠল। বীরসাও ব্রত নিয়েছে — "প্রাচীন জড়তা, অন্ধ কুসংস্কার থেকে মুণ্ডাদের মুক্ত করে আজকের পৃথিবীতে, বর্তমান সময়ে নিয়ে আসতে চায়।" [৮] মুণ্ডাদের অরণ্যে অধিকার চাই, সেই আদিম যুগের মত। উলগুলানের আগুন ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত মুণ্ডারি গ্রামে। অবশেষে বীরসা সহ চারশো বিরাশি জন মুণ্ডা ধরা পড়ল। ১৯০০ সালের ৯ই জুন বন্দী বীরসার মৃত্যু হলেও শত শত বীরসাইটরা বেঁচে রইল উলগুলানের মন্ত্র বুকে নিয়ে। পরবর্তী উপন্যাস 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' উপন্যাসের নায়ক চোট্টিও বীরসার মন্ত্রশিষ্য। ধানী মুণ্ডা, চোট্টি মুণ্ডা বীরসাইট হয়ে মহাজন ও পুলিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। তাদের প্রকৃত বিদ্রোহ ছিল বেঠবেগারীর বিরুদ্ধে। উপন্যাসের অনেকাংশই জুড়ে রয়েছে বীরসাইট চোট্টির বিদ্রোহী রূপ। তবে বাকী অংশ এগিয়েছে পরবর্তীকালের বেশ কিছু গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন প্রভৃতি দুর্যোগময় পথ পেরিয়ে বীরসাইট চোট্টি হয়ে যায় কিংবদন্তী। বীরসার উত্তরাধিকারী চোট্টির বিদ্রোহ আরো ব্যাপকতর স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পের নায়ক স্টীফানও অনুভব করে তার জাতির অস্তিত্বের সংকট। খ্রীষ্টান মিশনারিরা তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে। এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সেও মিশনারি থেকে ফিরে যায় তার নিজের পথে — বীরসার পথে, যে পথের সন্ধান সে করেছে এতকাল ধরে। আজ সে বীরসাইট রুন্নু হোরো। যদিও স্টীফান আজ পরাজিত। ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গী চিরকী মুর্মু, যাকে সে ভালবাসত সেও আজ খ্রীষ্টান হয়ে ফাদার লিগুনের মিশনে চলে গেছে। খ্রীষ্টান মিশনারির এ আগ্রাসনের ভয়ানক রূপ অঙ্কিত হয়েছে 'শতকিয়া' উপন্যাসে। মুরলী ও দাশুর দাম্পত্য জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে মিশনারির প্রচন্ড প্রভাব। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রন করেছে খ্রীষ্টান মিশনারির সিস্টার মাদলিন। একইভাবে স্টীফানের কাছ থেকে চিরকীকে সরিয়ে নিয়েছে খ্রীষ্টান ফাদার লিগুন। এদিক থেকে স্টীফানের পরাজয় হয়েছে ঠিকই কিন্তু অন্য অর্থে স্টীফান জয়ী হয়েছে, আদিম প্রবৃত্তি নারীর আকর্ষণকে

অতিক্রম করে স্টীফান আজ বীরসাইট রুন্‌নু, কারণ অরণ্যের অধিকারের স্বপ্ন তার চোখে। চির্‌কীকে হারিয়ে, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রুন্‌নু ফিরে গেছে আদিম অরণ্যের বুকে। যেখানে পরাজিত সন্তানের জন্য তার জননী অপেক্ষা করে আছে। আদিম অরণ্যের জন্য মুণ্ডাদের এ আন্দোলন একভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনেরই অংশ। বাঙালীরা যখন নন্‌-কো-অপারেশন আন্দোলন শুরু করেছে মুণ্ডারা তখন খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের প্রচারাভিযানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কারণ খ্রীষ্টান মিশনারিরা শিক্ষা ও ধর্মের নামে প্রচন্ড এক আগ্রাসন চালিয়েছে। মুণ্ডা জাতির প্রতি এই আগ্রাসন বাঙালীদের চোখে পড়লেও এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেছে। ফাদার লিগুনের কীর্তি তাদের নখদর্পনে এবং তারা ভাবে — "আমরা শুধু মনমরা হয়ে ভাবতাম ফাদার লিগুনের এই রহস্যময় আনাগোনা কবে বন্ধ হবে?" (পৃ. ২০৯) - তবুও তারা মুণ্ডাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়ায়নি কোনদিন। বরং তারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে স্টীফানদের হারিয়ে দিয়েছে। দূর থেকে সমস্ত ফাঁকফোকর গুলি তারা দেখেছে এবং স্টীফানদের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অথচ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ আরো দ্রুত হতে পারত, যদি আত্মকেন্দ্রিক বাঙালীরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে না দেখত। মধ্যবিত্ত বাঙালীর ভন্ডামি স্বাধীনতার সেই স্বপ্নকেও ভেঙে দিয়েছে।

মধ্যবিত্ত বাঙালী আত্মপ্রতারক যুবকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সুবোধ ঘোষের ক্লান্তিহীন প্রয়াস। পুথিগত আদর্শ বনাম বাস্তবের জীবন দুই এর মাঝে দোলাচলচিত্ত চরিত্র বেশ কিছু অঙ্কন করেছেন। এমনিভাবেই ইতিহাস ও বাস্তবের সংঘাত দেখালেন 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' গল্পে। বিমল বসু ইতিহাসের অধ্যাপক। প্রথম দিন থেকে তিনি ছাত্রদের অশোকের বাণী শুনিয়ে মোহাবিষ্ট করে রাখেন। ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মত ইতিহাসের ক্লাস করে। কলেজের অন্যান্য ক্লাসগুলোতেও তারা ততবেশী আগ্রহী নয়। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে না থাকা বিষয়গুলিকেও ছাত্ররা বিমল বসুর চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করে। তাঁর কাছেই ছাত্ররা 'দি গ্রেট অশোকের' ইতিহাস শোনে, একই সঙ্গে জানতে পারে আদর্শবাদ ও বস্তুবাদ দুয়ের পার্থক্য। বিমল বাবুর কাছে ছাত্ররা শিখেছিল — "অন্য সম্প্রদায়কেও বিশেষ বিশেষ কারণে শ্রদ্ধা করা উচিত।" ছাত্রদের সামনে তাঁর পুথিগত বিদ্যার বুলি আওড়ালেও অধ্যাপকের আচরণে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়। কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রদের নজরে পড়ে খ্রীষ্টান মেয়ে স্টেলা হেমব্রাম এর প্রতি অধ্যাপকের দুর্বলতা। শুধু তাই নয় অশোকের জীবনের একটি দিক যেন ধরা পড়ে অধ্যাপক বসুর মধ্যেও। দামাস্কা গোলাপ হাতে কোন প্রেয়সীর অভিসারে যাত্রা করেন অধ্যাপক বসু। ছাত্রদের কাছে তাঁর গ্রেটনেস আরও বেড়ে চলে। ইতিহাস ও বস্তুবাদ এক নয় ক্লাসের লেকচারগুলোতে তিনি তাই শিখিয়েছেন, আর অশোকের আড়ালে নিজের আত্মম্ভরিতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। হয়ত ক্লাসের পরীক্ষা, নম্বর এগুলোকে এড়িয়ে যাবার জন্যই তিনি এমন গ্রেটনেসের ভান করেন। শেষপর্যন্ত ধরা পড়েন প্রতারক বিমল বসু। তাঁর এতদিনকার আচরণের

216613
11 JUN 2009
NBU DARJEELING • LIBRARY •

সমস্তটাই ভান বা মেকী মাত্র। এমনকি স্টেলা হেমব্রামের প্রতি দুর্বলতা ও তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কটাও ভান মাত্র। তাই একদিন তাঁর সমস্ত মুখোশ খুলে পড়ে। একই সঙ্গে রাজত্ব ও রাজকন্যা পেতে বিমল বসু তাঁর আড়াইশো টাকা মাইনের মাস্টারি ছেড়ে চলে যান কলকাতা শহরে। আত্মপ্রতারক বিমল বসুর প্রতি তীব্র ব্যঙ্গের চাবুক দিতেই সুবোধ ঘোষ বলেন 'বিমল বসু দি গ্রেট।'

অধ্যাপক বিমল বসুর মতই আদর্শবাদের বুলি আউড়ে এবং জীবনকে রাংতার মোড়কে ঢেকে রেখেছেন 'কোটেশন' গল্পের ভাস্করবাবু। কলেজের প্রফেসর ভাস্করবাবুর বক্তৃতায় সকলেই সম্মোহিত হয়ে যায়। কতগুলি পুথিগত আইডিয়া তার জীবনকে নিয়ন্ত্রন করে। নরেন, জীবেন ও অমিয় তিনবন্ধুকে ভাস্করবাবু ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। আবার তারাই মাঝে মাঝে ভাস্কর বাবুর সমালোচনায় মুখর। প্রভার সঙ্গে বিয়ের দিন বাসর ঘরে নারীমহলের আচরণকে অবজ্ঞা করে ভাস্কর। এদের সম্পর্কে ভাস্কর বাবুর মন্তব্য — "এই শহরের মানুষগুলো আইডিয়ার দিক দিয়ে অত্যন্ত ব্যাকওয়ার্ড। মেডিভ্যালও নয়, একেবারে স্টোন এজ"। (পৃ.১৮১) প্রস্তর যুগের মানুষের মত এই শহুরে জনজীবনও এগিয়ে চলেছে বিশেষ কোন আদর্শ ছাড়াই। তার মুখে সবসময়ই শোনা যায় বিশিষ্ট দার্শনিক বা লেখকের এক একটি উদ্ধৃতি। জানা যায়, কোথাও নিমন্ত্রন খেতে যাবার পূর্ব মুহূর্তেও সে কিছু বইপত্র হাতড়ে কোন না কোন উক্তি সঞ্চয় করে নেয়। অথচ বাস্তব জীবন যে সবসময় সেই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না, এমনকি ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলিও। ভাস্কর সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই প্রভার সঙ্গে তার সম্পর্কের মাঝেও পুথিগত বিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে, প্রভার যন্ত্রণাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি না করে ভাস্কর তার পুথিগত বিদ্যায় বলে — "টিয়ার্স, আইডল টিয়ার্স।" বিদ্রূপ করে ওঠে প্রভা "বা, বেশ সুন্দর কোটেশন। ছিঃ। .... ঘরের মানুষকে নিজের ভাষায় একটা সান্ত্বনাও দিতে পারলে না। ছিঃ।" (পৃ. ১৮৮) কোটেশন যেন শামুকের শক্ত খোলসের মতো একটা খোলোস। তাই বাইরে থেকে কঠিন মনে হলেও ভিতরের প্রাণীটি ভীরু, স্পর্শকাতর। নিজের দুর্বলতা ঢাকতে একটা মুখোশ মাত্র এই কোটেশন। এমনকি সে নিজেও ভুলে গেছে আসল নকলের ভেদ। তাই ঘনিষ্টতম আবেগ, অনুভূতি প্রকাশের মুহূর্তেও সে সাহায্য নেয় কোটেশনের। এক চূড়ান্ত আত্মবিস্মৃত মানুষ। শিক্ষাকে বাহ্যিক মোড়ক হিসাবে ব্যবহারের পরিণতি। এতদিন ভাস্কর অন্ধের মত রিল্‌কে, কাফ্‌কা, ভেরলাঁ, মার্কস, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি ও তাত্ত্বিকের আইডিয়া বা তত্ত্বের অনুকরণ করেছে। সেই অন্ধ অনুকরণ এবং ফাঁপা আইডিয়া নিয়ে মধ্যবিত্তীয় সমাজের প্রতিনিধি ভাস্কর নিজের প্রকৃতিকে চাপা দিয়ে রেখেছিল, কিন্তু তার মুখোশ খুলে যায় প্রভার কাছে, এমনকি ভাস্করের নিজের কাছেও। প্রভা-বিনয়ের স্বাভাবিক কথোপকথন এবং তার নিজের প্রতি ভুলুবাবুর ধিক্কারে সে বুঝতে পারে নারী মনের প্রকৃত রহস্য কোন আইডিয়া বা তত্ত্ব দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়। পুথিগত আদর্শের বাহ্যিক আবরণটুকু এবার তার খসে পড়ে।

মধ্যবিত্তের মোহবিকার তার বোধ বুদ্ধিকে একভাবে নিঃস্ব করে। 'উচলে চড়িনু' গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবক দিনেশ, দত্ত কোম্পানির অভ্রখনির ওভারম্যান। বেতন পয়ত্রিশ টাকা। বাঙালী সমাজে কানা খোঁড়া সবরকম যুবকেরই যেখানে বিয়ের ফুল ফোটে, সেখানে দিনেশ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। স্বল্প রোজগারের কারণে, সামাজিক বঞ্চনা ও আর্থিক দীনতার কারণে কন্যাপক্ষ আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে এমন পাত্র থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান পুরুষ দিনেশ কলেজজীবনে যে প্রশংসা আর পুরস্কার লাভ করেছে তা এখন শুধুই স্মৃতির মনিকোঠায়। তবু তার যৌবনাকাঙ্ক্ষা দিনরাত মাথা খুড়ে মরে। জৈবিক তৃষ্ণা মেটাতে দিনেশ অসামাজিক পথ বেছে নেয়। খনির মজুরনী বিলাসীর আসঙ্গ লাভ করতে তার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সারার রূপ এবং ভঙ্গী দিনেশের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। বিপরীত মেরুর দুই নারীর আহ্বানে ব্যাকুল দিনেশ দিশেহারা। প্রথম যেদিন দিনেশ সারার কাছ থেকে ভালোবাসা বা মোহব্বতের কথা শোনে, সেদিন চমকে ওঠে। পথে তুলে নেওয়া আর পথেই ফেলে দেওয়া যাদের আনন্দ সেইসব যাযাবরের মুখে ভালোবাসার কথায় দিনেশ অবাক হয়েছে। একই সঙ্গে জীবনে বঞ্চনার ক্ষতে প্রথম প্রলেপও পড়েছে। সমাজ তাকে এতদিন অবহেলা আর বঞ্চনা করে এসেছে অথচ তার সেই অবমানিত পৌরুষের তোরণে ইরানী মেয়ে সারা সকল উদ্‌ভ্রান্তি শান্ত করে দিয়েছে, 'নতুন করে যেন মধ্য এশিয়া জয় করলো সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত।' — যদিও বরপণের সমাজ থেকে অবহেলিত পৌরুষের প্রতিনিধি দিনেশ, কন্যাপণ দিয়ে সারাকে কিনে নিয়েছে, তবু যেন এই কাঙ্ক্ষিত মিলনে রয়েছে প্রচন্ড এক তৃপ্তি। অন্যদিকে অভ্রখনির মজুরনী বিলাসীর প্রতি ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে দিনেশ। "আরো মুস্কিল হয়েছে ভদ্রলোক হয়ে, লেখাপড়া শিখে। জীবনের দুর্ধর আবেগ টেনে নিয়ে যায় পাতালের দিকে। বিলাসীকে নিয়ে যে জনরব গড়ে উঠেছে তার সম্বন্ধে — সেটা সত্য হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু রুচিতে বাধে। পদে পদে ভদ্রয়ানার নিষেধ-ভীরুতা।" (পৃ. ৯৫) -কিন্তু তার এই অবদমিত বাসনা একসময় হিংস্র হয়ে উঠল। জীবনের দুই তীরে তারা দিনেশকে টানে - "বিলাসী ডাকে মৃত্যুর গহনে, আর সারা ডাকছে জীবনের খরস্রোতে।" (পৃ. ১০৪) — সারার চোখের দিকে তাকিয়ে ভেসে যাবার আহ্বান শুনতে পায়, অন্যদিকে বিলাসীর কালো চোখ শুধুই ভোগবতীর অতলে তলিয়ে যাবার আহ্বান জানায় যেন। শেষ পর্যন্ত সারার প্রখর অনুরোধে সম্মতি জানায়, যদিও একবারের জন্য হলেও তার নিরেট ভালোমানুষী ভীরুতা নাড়া খেয়ে ওঠে। পয়ত্রিশ টাকা মাইনের ওভারম্যান তার পৌরুষত্ব প্রমাণের সুযোগ পেয়েছে, সংগ্রহ করতে হবে হাজার টাকা। অথচ সহজলভ্যা বিলাসীকে তুচ্ছ করেছে দিনেশ। সারাকে পাবার সোপান হিসাবে ব্যবহার করেছে বিলাসীকে। যে সমাজ তাকে অভ্রখনির ওভারম্যান করে পাঠিয়েছিল, যে সমাজ দিনেশকে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছিল, সে সমাজের মেয়ে বিলাসীকে সে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে সারার মুখের হাসি। কারণ বিলাসীকে গ্রহণ করাও সামাজিক ভাবে স্বীকার্য নয়। ঐ সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ এবং কন্যাপণের টাকা

সংগ্রহের মধ্য দিয়ে দিনেশ তার হৃত পৌরুষত্বকে পুনরায় মর্যাদার শিখরে স্থান দিয়েছে। কিন্তু যাযাবর মেয়ে সারা দিনেশকে উপরে ওঠার মই দিয়ে যেন মইটি কেড়ে দিয়েছে, মুখ থুবড়ে পড়েছে দিনেশ। সারাকে পাবার জন্য সময়মত কন্যাপণ যোগাড় করলেও নিজের এবং দলের প্রয়োজনে সারা নিপুণ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দিনেশকে ঠকিয়ে টাকার তোড়া সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যায়। দিনেশের শিক্ষা রুচির সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবতার দুস্তর ব্যবধান প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকশ্রেণী পুঁজিবাদী মানুষদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। কিন্তু তাদের আদর্শ ও শিক্ষার আবরণটি ঐ সমাজের বিরোধিতা করে। 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ' গল্পের শিক্ষিত যুবক কান্তিকুমারের হৃদয়বৃত্তি চাপা পড়ে যায় পুঁজিবাদী শাসনের কাছে। তাই প্রতাপবাবুর মেয়ে জয়াকে ভালোবাসলেও আর্থিক অসঙ্গতির কাছে তার ভালোবাসা মাথা নত করে। পুঁজিপতি অটলনাথ বসুর জীবনী রচনার দায়িত্ব নেয় কান্তিকুমার, কিন্তু তার কারবারে যোগ দেবার প্রস্তাবে তার শিক্ষিত রুচি আহত হয় — "লোভ দেখাবেন না অটলবাবু, আপনার সঙ্গে কারবার করে বড় মানুষ হবার কোন মোহ নেই আমার।" (পৃ. ১৫৬) কান্তিকুমার বুঝতে পারে আদর্শ আর বাস্তবতার সংঘাত শুরু হয়েছে এবার। এই সংঘাতের প্রভাব বিস্তৃত রূপ নিল। এদিকে বাণিজ্যবীর অটলনাথের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিল রিক্ত নিঃস্ব প্রতাপবাবু, এমনকি তার মেয়ে জয়াও আশ্রয় পেল অটলনাথের শুদ্ধান্তপুরে। আর পরোপকারী, কৃতজ্ঞ, অতিভদ্র শিক্ষিত যুবক কান্তিকুমার ঘাড় গুঁজে সমস্ত অপমানকে সহ্য করে গেল। পুথিগত আদর্শ শুধুই তার অন্তরে স্তূপের আকার ধারণ করল। তাকে প্রয়োগের কোন পদ্ধতি তার জানা নেই। এমনকি ভালোবাসার মানুষকে ফিরে পেতে তার যে শক্তিমত্তার প্রয়োজন ছিল কান্তিকুমারের মেরুদণ্ডহীন শরীরে তা নেই। তাই অটলনাথের নির্দেশ মত "সুবাধ্য টাটু ঘোড়ার মত তাড়া খেয়ে, খুট্ খাট্ খুরের শব্দ করে দরজার দিকে পা চালিয়ে চললো।" (পৃ. ১৬৫) ধনুকের মত বাঁকা মেরুদণ্ড নিয়ে কান্তিকুমারও অটলনাথের ক্রীড়ণকে পরিণত হয়ে যায়। ভীরু কাপুরুষ বাঙালী মধ্যবিত্তের এই প্রকৃত চেহারা। এক সময়কার প্রহসনকারেদের মতই এইসব শ্রেণীর জীবন জটিলতাকে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। তাই বারংবার মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাঁর রচনার বিষয় হয়ে ওঠে। স্বদেশী কর্মী, যোদ্ধা আবার সমাজের উচু স্তরের মানুষেরও নিছক ভণ্ডামির মুখোশকে এক টানে খুলে দেন।

'স্নানযাত্রা' গল্পের দেশসেবক ইন্দুনাথও এই পথের পথিক। স্নানযাত্রার মেলায় রোজগারের আশায় যে সমস্ত পতিতারা এসে হাজির হয়েছে, পিকেটিং করে সামাজিক কুপ্রথাটিকে বন্ধ করে দিতে ইন্দুনাথ বদ্ধপরিকর। ইন্দুনাথের ইচ্ছার এই ব্যস্ততা যেন তার অভিমানের ব্যস্ততা। নানা ঘাত প্রতিঘাত, অত্যাচার উপদ্রবের মোকাবিলা করে ইন্দুনাথ। একা একা টহল দিয়ে বেড়ায় সারা রাত। এরই মাঝে ইন্দুনাথের পুরনো বন্ধু জমিদারের সন্তান চিরঞ্জীব ইন্দুনাথের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে ওঠে। ইন্দুর আদর্শের মাথায় লাঠির আঘাত দিতেও পিছপা নয় চিরঞ্জীব। ইন্দুর আদর্শকে মিথ্যে করে দিতে তাকে সে বলে —

"কিন্তু, শেষ যেন আমারই ইচ্ছা না হয় পূর্ণ তোমার জীবন মাঝে।" — পতিতা পল্লীর পতিতাদের রোজগার বন্ধ করে দিতেই তারা স্বদেশীদের কাছে এসে হাজির হয়, রোজগার বন্ধ হলে তারা যে নিরন্ন হয়ে যাবে। আধুনিক শিক্ষার আদর্শকে কাজে লাগাতে মধ্যবিত্ত সুলভ মানসিকতায় গড়ে ওঠা আদর্শবাদী ইন্দুনাথ তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেয় একমাসের জন্য নিজেই তাদের খোরাকের জোগান দেবে। এই বন্দোবস্তে সকলের সম্মতিতে ইন্দুনাথের রিলিফের কাজ শুরু হয়। নিজের সম্পত্তি বন্ধকী দিয়ে টাকা আনিয়ে রিলিফের দান পৌঁছে দেয় ঘরে ঘরে। এরই ফাঁকে পতিতা উপনিবেশের একটি ঘরের এক নারী তুচ্ছ করেছে তার রিলিফের দানকে। ক্রমশ ইন্দুনাথের মনের ঘরে স্থান নিতে থাকে পতিতা মেয়েটি। পূর্ণিমা ওরফে সোনালীর জীবনকে ঘিরে ইন্দুনাথ স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে। পূর্ণিমাও একসময় কর্মীদলের সঙ্গে যোগ দেয়। এমনকি ক্যাম্প শেষে যেদিন ইন্দুদের চলে যাওয়ার দিন আসন্ন সেদিন বটেশ্বরপুরের মায়াময় জ্যোৎস্না তাকে আকৃষ্ট করে। নতুন করে ইন্দুনাথ আবিষ্কার করে সোনালীকে। জীবনের যে ব্রত ও আদর্শকে গ্রহণ করে কর্মক্ষেত্রে এসেছিল তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। তার সত্তাকে ভুলে গিয়ে, সমস্ত আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে সোনালীর ঘরে ইন্দুনাথই প্রবেশ করেছে। সোনালী তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে — "তুমি ভুল করে আমার ঘরে ঢুকেছিলে।" - ইন্দুনাথের দুঃসাহসী আত্মা ভীরু ছায়ার মত ছটফট করে ওঠে। নিজের প্রতিই যেন তার চরম বিদ্রোহ প্রকাশ পায়।

বাঙালী জীবনের আদর্শ ও ব্রত কর্তব্যের শেষ সীমায় এসে কিভাবে থমকে যায়, ভীরু কাপুরুষের মত পলায়ন করে তারই চরম দৃষ্টান্ত 'বৈরনির্য্যাতন' গল্পের দিলীপ দত্ত। সমস্ত 'শ্বেতাঙ্গ বিমান বিহারীদের মধ্যে মাত্র একটি কৃষ্ণের জীব' দিলীপ দত্ত নিজেই জানেনা তার অন্তরাত্মা কি চায়? কখনো সে তার বাহুবলকে প্রমাণ করতে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় হিন্দুপক্ষের নেতৃত্ব দিয়েছে, আবার সেই চাকরি সূত্রে সে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। আসলে সে তার অহংবোধকে জাগিয়ে রাখতে চায়। এমনকি পোশাকি পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও সে তার বাঙালী অভিমানকে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু বিমান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পরই তার সমস্ত পৌরুষ ভীরুতার প্রমাণ দেয়। সহকর্মীরা যখন উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেছে তখন দিলীপ দত্ত শত্রুপুরীর মাঝে আবিষ্কার করে ছেলেবেলায় শোনা রূপকথার দেশকে। অন্যদের চোখে মুখে যখন উচ্ছল আনন্দের প্রকাশ তখন "দিলীপের অন্তরাত্মা যেন ধরা পড়া চোরের মত আসরের এক কোণে মাথা গুঁজে পড়ে রইল। ... একেই বলে ভীরু কাপুরুষ, একেবারে হৃদয় ভাপের ভাপে ভরা ফানুস।" (পৃ.১৩১) - যুদ্ধ থেকে পলায়মান দিলীপের গৌরব প্ল্যাটফর্মের কাঁকড়ে লুটিয়ে পড়ে। মধ্যবিত্ত বাঙালী চরিত্র মূলত ভাপে ভরা ফানুসেরই মত। বাইরের সমাজের কাছে তারা যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করে তার সঙ্গে তাদের প্রকৃত সত্তার ফারাকটি যোজনব্যাপী।

'শ্মশানচাঁপা' গল্পের মূল বিষয়টিও সেখানেই কেন্দ্রীভূত। উত্তম পুরুষে লেখা এই গল্পে

গল্পকার স্বয়ং একটি বান্ধব সমিতির সঙ্গে জড়িত, কাঞ্চনকাকা যে সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা। শবদেহ বহনকারী এই দলটি শ্মশানে এসে লক্ষ্য করেছে ঘাটবাবু সারাদিনরাত জেগে হিসেব রাখে মৃতের সংখ্যা ও তাদের পরিচয়। সুতরাং সাধারণ বিচার বুদ্ধি এবং রুচিগত দিক থেকে এই সমিতির প্রত্যেক সদস্যই ঘাটবাবুকে ঘৃণা বা অবহেলা করে। শুধু তাই নয় ঘাটবাবুর প্রকৃত নামটিও ভুলে গেছে এই সভ্যসমাজ। সম্পূর্ণ অবহেলিত এই চরিত্রটি মিলে যায় 'তিন অধ্যায়' গল্পের অহিভূষণ চরিত্রের সঙ্গে। সেও নদর্মার নোংরায় নেমে সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের দায়িত্ব পালন ক'রে বন্ধুমহলে ব্রাত্য। এমনকি ঘাটবাবুর বিবাহিত জীবনের কথা জানতে পেরে সকলেই সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে — "যে লোকটা তার নিজের পরিচয় বলতে পারেনা, সেই লোকটা শেষ পর্যন্ত কোথায় কোন্ এক সুখী ঘরের জাত সমাজ ও বংশের বেড়া ভেঙে একটা মেয়েকে যেন চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছে।" (পৃ. ৪৬) কাঞ্চনকাকা সহ অন্য সকলের কেউই ঘাটবাবুর ঐ জীবনকে মেনে নিতে পারে না। তারা মনে করে, যে ঐ ছাই ধোঁয়া আর অন্ধকারের মাঝে দিনরাত কাটায় তার আলোতে আসার বা ভদ্র সমাজে আসার কোন অধিকার নেই। কিন্তু ভদ্র সমাজের মুখোশধারী কুমারসাহেবের পরস্ত্রী হরণ বা ঐ ধরনের কুকীর্তির কথা জেনেও এই সমাজ তাদের কুকীর্তিকে যত্নসহকারে চাপা দিয়ে রাখে। বৈভব দিয়ে সম্মান কেনা যায় অনায়াসে। যদিও বাহ্যিক রূপটানের আড়ালে চাপা দেওয়া সেই ক্লেদ একসময় ফুটে বেড়োয়। ঘাটবাবুর রেজিস্ট্রিখাতায় লেখা একটি নাম ঠিকানা জীবনের সত্যকে প্রকাশ করে, মুখোশ খুলে ফেলে কাঞ্চনকাকা বা কুমারসাহেবের মত ভণ্ডদের। যেদিন কুমার সাহেবের অনেক রানিজীর মধ্যে একজনের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে আসা হল সেদিন ঘাটবাবু তার হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছে ঐ মৃতার প্রতি, কারণ সেই আসলে তার হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী। ভদ্র সমাজের প্রতিনিধি কুমার সাহেব যাকে অপহরণ করেছিল। ঘাটবাবু ওরফে মাধব গাঙ্গুলী জীবনের প্রকৃত পরিচয় জেনেছে বলেই মৃত্যুর মাঝে শ্মশানের কিনারায় এসে অপেক্ষা করে, অথচ তথাকথিত নাগরিক সভ্য মানুষেরা খুঁজে বেড়ায় জীবনের প্রকৃত সত্য। ঘাটবাবু শ্মশানের ঘাটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে এইবার তার ছেলে ফিরে আসবে তার কাছে। যে জীবন তাকে শান্তি দিতে পারেনি, মৃত্যু তাকে দেবে সেই শান্তি। ঘাটবাবুর এই অপেক্ষা মর্মান্তিক হাহাকারে মুখোশ খুলে ফেলে সামাজিক হৃদয়হীনতার। কারণ তারাই কখনো প্রত্যক্ষে, কখনো পরোক্ষে থেকে ঘাটবাবুকে বেঁচে থাকার শান্তি থেকে বঞ্চিত করেছিল। কিন্তু, শ্মশানের বন্ধ্যা নিস্ফলা চাঁপা গাছের মত ঘাটবাবুও স্বপ্ন দেখে, যে স্বপ্ন বাস্তব ও কল্পনার মাঝে ভয়ঙ্কর এক জীবন সত্যের সন্ধান দেয়। উন্মোচন করে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মূল্যবোধহীনতা। মধ্যবিত্ত সমাজ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য যে স্বপ্ন দেখে, পুথিগত বিদ্যা অর্জন করে তাকেই যখন বাস্তবায়িত করতে যায়, তখনই তারা হোঁচট খায়। কেউ বা প্রথম থেকেই এক অর্জিত বিদ্যার খোলসের মধ্যে ঢেকে রাখতে চায় প্রকৃত আত্মস্বরূপকে, কিন্তু বাস্তবতার রূঢ় সংঘাতে সেই মধ্যবিত্তীয় খোলসটি খসে পড়ে। ধরা পড়ে হৃদয়হীন, আত্মপ্রতারক চরিত্রেরা। সুবোধ ঘোষের অভিজ্ঞতাজাত জীবনের নানা দিকের নগ্ন প্রকাশেরই সাক্ষ্য এইসব গল্পগুলি।

'শক থেরাপি' গল্পের মূল চরিত্র বেসিল মূর, খ্রীষ্টান এবং পাগল। ইয়র্কশায়ারের লোক বুড়ো মূর কার্যসূত্রে ভারতবর্ষে বাস করে এবং আজ তারা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান রূপেই পরিচিত। বুড়ো মূর বেসিলকে আর্মিতে যোগ দেওয়াতে চেষ্টা করে। ভারতে অবস্থিত সাহেব মেমেদের পার্টিতে যাবার জন্য জোর করে। সামাজিক এই বোঝাগুলি বেসিলের সহজাত সত্তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে সে মনে করে। ফলে তার স্বাভাবিকতা, স্বতস্ফূর্ততা ক্রমশই লোপ পেয়ে তাকে পাগল করে দিচ্ছে। তার এই পাগলামি আসলে সামাজিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিলিতি পার্টিতে বেসিলের আচরণ থেকে মেমেরা যেমন ক্ষুব্ধ হয়েছে, তেমনই ক্ষুব্ধ হয়েছে বুড়ো মূর। বেসিল তার স্বভাবসিদ্ধ আচরণ করে বেড়ায় সকল স্থানে। সামাজিক কৃত্রিমতাকে সে ভয় করে, তাই তো খ্যাপা সেজে পরশপাথর খোঁজার চেষ্টা করে। হকি টুর্নামেন্টে একাদশ প্যান্থারের দলে যোগ দেয় এবং ট্রফি জেতে একাদশ প্যান্থার। কিন্তু কোন দলই তাকে বুঝে উঠতে পারেনা, একের পর এক তরুণ সমিতি, বাহাদুর ক্লাব এসব দলে বেসিল যোগ দেয়। বাহাদুর ক্লাবের সদস্যরা বেশির ভাগই মোটরবাসের খালাসী, সকলেরই এবার ধারণা হল বেসিলের অধঃপতন হয়েছে। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন — "কোন আপত্তি ওর গতিরোধ করতে পারছে না। যেন অজস্র মূঢ়তার অনু-পরমানু দিয়ে সে গড়ে তুলেছে নিজের এক বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড। তাই একটা বিজাগতিক আহ্লাদে মজে আছে ওর সমস্ত সত্তা। অপ্রমেয় উৎসাহে, অদ্ভুত ক্ষুরধার নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারের মাটি কেটে কেটে নীচে নেমে চলেছে সে। কোথায় যে পাগলের কোহিনূর লুকিয়ে আছে তা সেই জানে।" (পৃ.৩২৬) সামাজিক ভণ্ডামির স্তুপ কেটে কেটে প্রকৃত মানুষের সন্ধানে বেসিলকে অধঃপাতে যেতে হয়েছে ঠিকই। বাহাদুর ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সবজিওয়ালা প্রাণকুমারের বাড়িতে তার সান্ধ্য আড্ডা শুরু হয় এবং হিন্দুরমনী চম্পার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়। প্রাণকুমারের স্ত্রী চম্পাও আকৃষ্ট হয় বেসিলের প্রতি। হিন্দু সমাজের বাহ্যিক বন্ধন, স্ত্রী বা জননীর বন্ধন ছিন্ন করতে পারেনি চম্পা। অথচ দোলের দিন বেসিল এক মুঠো ফাগ চম্পার গালে লেপে দিয়েছিল, বলতে চেয়েছিল তার মুগ্ধতার কথা, ভালোবাসার কথা। চম্পা বাধা দিয়েছে। চম্পা নিজেও যদি অকপট হতে পারত তবে খ্যাপার পরশপাথর খোঁজা শান্ত হতো। তা অবশ্য হল না। সেদিন থেকে ভীষণ জ্বর হল চম্পার এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। চম্পার মৃত শরীরটাকে রোষ্ট করতে দেখে আবারও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে বেসিল। শ্মশানযাত্রীদের ওপর চড়াও হয়, নিজেও আক্রান্ত হয়। তারপর ছুটে এসে ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ঘুম ভাঙে তখন আবার তার পুরনো শায়ারের কথা মনে পড়ে, তার সমস্ত বিদ্রোহ পরাজিত হয়ে থেমে পড়ে। যে ভয়ঙ্কর অভিযাত্রার পথে সে পা বাড়িয়ে ছিল, সেই পথ থেকে আবারও ফিরে যায় খোলসের ভেতরে। জাতি-ধর্ম এসবের ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিল, declassed হতে চেয়েছিল বেসিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও ফিরে যেতে বাধ্য হয় তার পুরনো গণ্ডীর মধ্যে। প্রতিটি মানুষই তার বিদ্রোহী সত্তার খাতিরে এভাবেই বিদ্রোহ জানাতে চায়, কিন্তু পরাজিত হয়

এভাবেই।

সুবোধ ঘোষের গল্পের কেন্দ্র হিসেবে আরও একটি বিষয় বারবার ফিরে আসে। নর-নারীর সম্পর্ক এবং তাদের প্রেমের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, ব্যথা বেদনা এবং যন্ত্রণার মনস্তাত্ত্বিক উদঘাটন। লক্ষনীয় যে, 'ভারত প্রেমকথা'- শিরোনামের অন্তর্গত কাহিনিগুলিতেও পৌরাণিক প্রসঙ্গের প্রেক্ষাপটে নর-নারীর সম্পর্কেরই আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পরিসরেও সেই সম্পর্কের পাপড়ি মোচন করেছেন তিনি। 'জতুগৃহ' নামক , গল্পের নামে রয়েছে মহাভারতীয় অনুষঙ্গ, তবে এর কাহিনি আধুনিক নর-নারীর জীবনের সংকটময় সংঘাত। পুরাণে বর্ণিত রয়েছে, পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীকে সঙ্গে নিয়ে বারবানত নগরে বাস করেন। সেখানে একটি সুসজ্জিত গৃহ নির্মাণ করা হয়, যার মৃত্তিকার সঙ্গে প্রচুর পরিমানে ঘি, তেল, বসা এবং জতু (গোলা) মিশিয়ে দেওয়ালে লেপ দেওয়া হয়েছিল। এই গৃহের চারদিকে দাহ্য পদার্থ এমনভাবে রাখা হয়েছিল যে সহজ পদ্ধতিতেই সেখানে আগুনের প্রবেশ সম্ভব এবং কৌরবপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল জতুগৃহ দাহ হলে পাণ্ডবের মৃত্যু অনিবার্য-যদিও তাদের এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। এই আগুন থেকে নিজেদের বাঁচাতে এক নিষাদ পরিবারকে ব্যবহার করেছিল পাণ্ডবেরা। বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নিরপরাধ মানুষগুলিকে মরতে হয়েছিল আগুনে পুড়ে। আধুনিক জীবনের সংকট ঘনীভূত হয়ে জতুগৃহের সৃষ্টি হয় আজও। তবে সেখানে সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা যায় না কোনো অপরাধী বা নিরপরাধীকে। ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে লেখক পাঠককে পৌঁছে দেন সাত বছরের বিবাহিত জীবনের বিচ্ছিন্ন দুটি নর-নারীর সম্পর্কের স্রোতে। শতদল দত্ত এবং মাধুরী রায় এক সময় পরস্পরকে ভালোবেসেই শুরু করেছিল তাদের দাম্পত্য জীবন। তারপর প্রাত্যহিকতায় তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে জীর্ণ হয়েছে। তাদের দুজনেরই বিশ্বাস জন্মায় এই যৌথ জীবনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী অন্য মানুষটি। শতদল দত্ত একসময় বিশ্বাস করতে শুরু করে তাদের দাম্পত্য জীবন বিষিয়ে তুলেছে মাধুরী, অন্যদিকে মাধুরীও শতদল দত্তকে সন্দেহ করতে শুরু করে। দুজনেই উপলব্ধি করে যে ভালোবাসার নীড় তারা রচনা করেছিল সেই নীড়ে ভালোবাসা বড়ই কৃপণ। নিছক থিয়েটারের সং সেজে ভালোবাসাহীন জীবন যাপন করতে রাজি নয় তারা। তাই একসময় আইনী ব্যবহারে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দুজনেই তারা হয় ভিন্ন জগতের অধিবাসী। শতদল দত্ত সেলাই স্কুলের শিক্ষয়িত্রীকে এবং মাধুরী অনাদি রায়কে বিবাহ করে স্বতন্ত্র জীবন যাপনে ব্যস্ত। মাঝের কয়েকটি বছর যে একেবারেই অদর্শনে কেটেছে সেকথা জানা যায় পাঁচ বছর পর বিজাপুর স্টেশনের ওয়েটিংরুমে পুনরায় দুজনের সাক্ষাৎকারে। একসময় যে সংসারকে জতুগৃহ ভেবে সেখান থেকে মুক্তি চেয়েছিল তারা সেই যৌথ জীবন এবং সান্নিধ্যের জন্য তারা উভয়েই মনে মনে কাতর বোধ করে। কিংবা বলা যায় তারা যেন পরস্পরকে নতুন রূপে আবিষ্কার করে। একে অপরের সাহচার্যে "চায়ে চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে শতদল। শুধু চায়ের আস্বাদ পেয়ে নিশ্চয় নয়, চায়ের সঙ্গে মাধুরীর হাতের

স্পর্শ মিশেছে, তৃষ্ণা মিটে যাবারই কথা।" (২১০ পৃ.) পুরনো সম্পর্কের ফাটল জুড়ে যেতে চায়, তাদের পাঁচ বছরের বিরহী আত্মা ফিরে পেতে চায় জীবনের ফেলে আসা অতীতকে। যে অতীতের মধুর দিনগুলি তাদেরই কারণে নষ্ট হয়েছে। আচমকা শতদল দত্ত "দুহাত দিয়ে ধরে রেখেছে তার এক হাত, যেন আবার হারিয়ে না যায়।"(পৃ.২১২) — জীবনের মুখোমুখি হয়ে অতীত ও বর্তমান এর সংঘাতে তাদের পরস্পরের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটে। কেউই ভুলতে পারেনি তাদের অতীতকে, যে সম্পর্ক একদিন ব্যবহৃত হতে হতে শূকরের মাংসে পরিণত হয়েছিল, আজ অনেকটা সময় পেড়িয়ে যখন তারা ফেলে আসা জীবনের দিকে তাকায় তখন অনুভব করে ভালোবাসার চোরাস্রোত। নিছক সন্দেহের বশে একে অপরকে ভুল বুঝেছিল, তাদের সম্পর্ক পরিণত হয়েছিল জতুগৃহে। মহাভারতে জতুগৃহ দাহ হলে পুরোচনের মৃত্যু হয়েছিল, গল্পে মাধুরী ও শতদল দুজনের মানসজগতই দগ্ধ হয়েছে। এই দহন বাইরে থেকে দেখা যায় না বলেই হয়তো সেই যন্ত্রণা আরও তীব্র। বিচ্ছেদ জীবনের পাঁচ বছর অতিক্রম করার পর সেই সত্য তারা আবিষ্কার করেছে। তারা দুজনেই কাতরভাবে আকাঙ্ক্ষা করে যদি একবার সুযোগ পাওয়া যায় ফিরে যাওয়ার, নতুন ভাবে শুরু করার। কিন্তু দুজনেই জানে তা হওয়ার নয়। যে সময় চলে যায় তা আর কখনও ফিরে আসে না। শতদল এবং মাধুরী দুজনেই পুনরায় বিবাহ করেছে। কিন্তু এই ক্ষণিক দর্শনে তারা দুজনেই অনুভব করে তাদের ফেলে আসা প্রস্তরীভূত সম্পর্কের পাথর ফাটিয়ে গভীর অনুভবের ফল্গুস্রোত প্রবাহিত। গল্পের পরিণতিতে গল্পকার একটি প্রতীক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই সম্পর্ককে এবং তার অবধারিত পরিণতিকে তুলে ধরেছেন — "রাজপুর জংশন আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে বয় এসে তুলে নিয়ে যাবে, ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রেখে দেবে, একটা পেয়ালা কাবার্ডের এই দিকে, আর একটা হয়তো একেবারে ঐ দিকে।" (২১৬ পৃ.) দুই প্রান্তে দুটি শূন্য কাপের উপুড় হয়ে পড়ে থাকা একভাবে নর-নারীর সম্পর্কের চিরবিচ্ছেদের প্রতীকী প্রকাশ। চলে যাবার আগে শতদল দত্ত মাধুরীকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে একবার তার বর্তমান স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে, আবার মাধুরীও পাল্টা নিমন্ত্রণ জানিয়েছে সুধাকে সঙ্গে নিয়ে শতদল দত্ত যেন একবার তার বাড়িতে যায়। দুজনের নিমন্ত্রণেই যেন প্রকৃত জতু বা গালা মিশে রইল, যে দাহ্য বস্তু চিরকাল তাদের দহন করবে। যে জতুগৃহ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল সেই জতুগৃহ নির্মিত হল এবার। শূন্য কাপের মতই তাদের ভালোবাসাহীন হৃদয় একেবারে শূন্য করে নিয়ে তারা দুজনেই ফিরে যাচ্ছে প্রকৃত জতুগৃহে।

নর-নারীর একে অপরকে আবিষ্কার সুবোধ ঘোষের গল্পের একটি প্রিয় বিষয়। দাম্পত্য সম্পর্কই শুধু নয়, প্রাক্ বিবাহিত জীবনের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিও কখনো কখনো তাঁর গল্পের বিষয়। এমনই একটি গল্প 'শুক্লাভিসার'। অভিসার বৈষ্ণব পদাবলীর একটি অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। দয়িত এবং দয়িতা একে অপরের ডাকে সাড়া দিয়ে মিলনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেই মিলনে কোন বাধা এলে তাকে জয় করে, সমস্ত বিপত্তিকে দূরে ঠেলে তারা অগ্রসর হয়। এমনকি এই মিলনের সময় নিজের অহং সত্তাকেও ভুলে যায়

তারা। নানা পর্যায়ে বিভক্ত অভিসারের একটি পর্যায় শুক্লাভিসার। এমনই এক অভিসারের কাহিনি সুবোধ ঘোষের গল্পে ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত। এই গল্পের চরিত্র দেবল ত্রিপাঠী যেন অনেকটাই 'রাজা' নাটকের রাজা চরিত্রের অনুরূপ। রানী সুদর্শনা যখন তাকে আলোয় দেখতে চান রাজা তাতে রাজি হননা, কারণ রানীর এই আলোর তৃষ্ণা তার মনের গভীর অন্ধকারকেই প্রমাণ করে এবং তা সমস্ত আলোক বিষিয়ে দেবে। রাজার মিলনের সময় এল সেদিন, যেদিন রানীর মনের অন্ধকার ঘুচে গেছে। সেদিন অন্ধকারেও রাজার সঙ্গে মিলনে আর কোন আপত্তি নেই রানীর। এই একই বিষয় লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্য গ্রন্থের 'অভিসার' কবিতার বাসবদত্তা চরিত্রের মধ্যে। নগরীর নটী যেদিন তাকে ব্যাকুল হয়ে আহ্বান জানিয়েছে সেদিন —

"সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে,
'অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,
এখনো আমার সময় হয়নি,
সেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী,
সময় যেদিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।" [৯] — এক বৎসর পর —

রোগাক্রান্ত নটীকে যখন সকলেই পরিত্যাগ করেছে। তার বিষাক্ত সঙ্গ থেকে মুক্তি চেয়ে সকলেই তাকে বাইরে ফেলে দিয়েছে। সেদিন সন্ন্যাসী তাকে গ্রহণ করেছে —

" 'কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়'
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয় —
আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা।" [১০] — অভিসারের পরমক্ষণটি সমাগত। 'রাজা'

নাটকের রাজা এবং 'অভিসার' কবিতার সন্ন্যাসী উপগুপ্ত দুই এর রূপেরই আভাস যেন ধরা পড়ে দেবল ত্রিপাঠী চরিত্র নির্মাণে। সকলের কাছে গুরুজী নামে পরিচিত দেবল সমাজের কল্যাণসাধনের ব্রত নিয়েছে। এরই ফাঁকে সে আবিষ্কার করেছে বিধবা বরুত্রীকে, বয়স তার অল্প। দেশে তার অন্ন জোটেনি বলে সে নেহাতই চাকরির খোঁজে বিদেশে এসেছে। একদিনের মধ্যে দেবল তাকে হরিজন মেয়েদের শিক্ষয়িত্রীর চাকরি দেয়। প্রথম দিনই দেবল তাকে যোগ্য গুরুর মত দীক্ষা দিয়েছে — "যে কাজ নিয়েছ তাকে ভালোবাসতে শেখ।" (৬১ পৃ.) - যথাযথই একদিন বরুত্রীর কাছে স্কুলটিই সর্বস্ব হয়ে উঠল। একই সঙ্গে ত্রিপাঠীকেও ভালোবেসে ফেলে বরুত্রী। তবু ত্রিপাঠীকে তার পাওয়া হয় না, কারণ তাদের দুয়ের মানসিক ব্যবধান বহু বিস্তৃত। সেকারণে বরুত্রী যখন ত্রিপাঠীর সঙ্গে থেকে তার কাজের অংশীদার হতে চায়, সেদিন রাজি হয় না

ত্রিপাঠী। সে বলে — "আর একটু ভেবে বলো বরুত্রী। এত তাড়াতাড়ি ওকথা বলতে নেই। ভুল হতে পারে।" (৬১ পৃ.) ত্রিপাঠীর মধ্যে তিলমাত্র হৃদয়ের তাপ লক্ষ্য করতে না পেরে বরুত্রীর যৌবনাকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই বরুত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয় পুস্কর মিত্রের। ধনী পিতার একমাত্র সন্তান পুস্কর শুধুমাত্র বরুত্রীর মনযোগ পাবার লোভেই হরিজনদের সেবা করে বেড়ায়। বারংবার সে বরুত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় এই সমাজসেবার ব্রত থেকে। কারণ তার কাছে এসব হল নোংরামি। কিন্তু বরুত্রীর ভাবতে ভালো লাগে, পুস্করকে সে নিজের পথে আনতে পেরেছে। তারই সঙ্গে পুস্কর বস্তিতে ঘুরে বেড়ায়, যদিও মুখে রুমাল চাপা দিতে হয় তাকে। বরুত্রীর সঙ্গে পুস্করের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করে ত্রিপাঠী অবশ্য একবার সাবধান করে দেয় যে, পুস্কর একজন অ্যাডভেঞ্চারার মাত্র। কিন্তু সেই সাবধান বাণীতে সতর্ক হওয়ার মানসিকতা তখন বরুত্রীর নেই। সে পুস্করের আকর্ষণকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। তারই ফলে পুস্করের সন্তান আসে তার গর্ভে। পুস্কর তার পিতৃত্বকে স্বীকার করে নিতে পারে না সহজে বরং বরুত্রীকে তার ব্রত থেকে সরিয়ে নিতে চায়, এই ঘটনাতেই ধাক্কা খেয়ে সম্বিত ফিরে পায় বরুত্রী। যেন এতকাল স্বপ্নের ঘোরে ছিল, সেখান থেকে নেমে আসে মাটিতে। হরিজন মেয়েদের স্কুল ছেড়ে তার জীবনের ব্রত ছেড়ে সে আলমোড়ার বাংলোয় গিয়ে শান্তি পাবে না। পুস্করের বহু অনুরোধেও বরুত্রী তার ব্রত ছাড়তে পারে না, বরং প্রত্যাখ্যান করে পুস্করকেই। বিধবা বরুত্রী ত্রিপাঠীর কাছে সমস্ত সত্য প্রকাশ করে স্কুল ছেড়ে চলে যেতে চায়। কারণ তার জীবনে যে কলঙ্কের দাগ লেগেছে তার ছোঁয়া এই স্কুলের গায়ে লাগতে দিতে চায় না সে। স্কুলের সম্মান বাঁচাতেই তাকে চলে যেতে হবে বলে তার বিশ্বাস। বরুত্রীর অন্তঃসত্তার পরিবর্তন সহজেই ধরে ফেলেছে দেবল। সে বুঝতে পারে কত বড় কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বরুত্রী। একদিন নেহাত চাকরির সন্ধানে এসেছিল যে মেয়ে, আজ তার কাছে তা শুধুই চাকরি নয়, এই সেবাই তার ব্রত। সেই ব্রতের পথ থেকে কখনো কখনো চ্যুত হলেও তার অস্তিত্বের নোঙর সেই মাটিতে। লোভ বা মোহের সাময়িক বিভ্রান্তি তার সেই শিকড় উপড়াতে পারে না। সকল অহংকার, সকল ঐশ্বর্যের পুরুষ পুস্করকেও সে ত্যাগ করতে পেরেছে। তার এই আত্মত্যাগের মহিমা নতুন করে উপলব্ধি করেছে দেবল "পাথর ছড়ানো কাজের পথে এতদিনে যেন একটি স্ফটিক আবিষ্কার করেছে ত্রিপাঠী।" (৬৭ পৃ.) এবার বরুত্রীকে গ্রহণ করা দেবলের পক্ষে সহজ হয়েছে; কারণ বরুত্রী এখন যোগ্য সহধর্মিনী, স্ত্রী হিসেবে নয়, ব্রতের সঙ্গী হিসেবে। তাই পুস্করের সন্তানসহ বরুত্রীকে গ্রহণ করতে পেরেছে দেবল। যেমন ভাবে রাজা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর রানী সুদর্শনাকে, উপগুপ্ত গ্রহণ করেছিলেন বাসবদত্তাকে। নারী পুরুষের পরস্পরের ব্রতের সঙ্গী হওয়ার প্রসঙ্গ আছে রবীন্দ্রনাথের তিন সঙ্গীর গল্পগুলিতেও। 'ল্যাবরেটরী' গল্পে নন্দ কিশোরও সোহিনীকে তার অবৈধ সন্তান নীলা সহ গ্রহণ করেছিল, আপন ব্রতের সঙ্গিনী রূপে। বরুত্রী দেবলের মিলনের পথে, অভিসারের পথে অন্তরে বাইরে শুধুই জ্যোৎস্না। হৃদয়ের জ্যোৎস্নায় নর-নারী তাদের প্রকৃত সম্পর্ককে আবিষ্কার করে।

'থিরবিজুরী' গল্পটিতে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং সম্পর্কের গভীরে সুপ্ত জটিলতাকে প্রকাশ করেছেন সুবোধ ঘোষ। 'থিরবিজুরী' গল্পের নামকরণে রূপক অলঙ্কার গল্পটিকে গভীর তাৎপর্য দিয়েছে। যে বিজুরী কোন ভাবেই স্থির বা থির থাকতে পারেনা তারই ওপর অসম্ভব ধর্ম আরোপ করে থিরবিজুরী শব্দটিকে রূপকায়িত করা হয়েছে। গল্পেও এই রূপকটির বহিঃপ্রকাশ। নায়িকা চিত্রা রায়, দাম্পত্য জীবনের প্রথম পর্যায়ে নিখিল রায়ের সুন্দরী স্ত্রী হিসেবে যার পরিচয় ছিল। এক বছরের চর্চিত জীবনে অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী চিত্রা রায় স্বামী নিখিল রায়কে ছাপিয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে জনপ্রিয়তায়। নিখিল তার পাশে নিস্প্রভ, ম্লান। রূপের মহিমা সুন্দর চোখের মাঝে যে বিদ্যুৎ খেলে যায়, তাই দিয়ে সে বড় সাহেব বিনায়ক সরকারকেও জয় করেছে। জয়ী হয়েছে চিত্রা রায়ের চোখের বিদ্যুৎ। অন্যদিকে সাইফারে পরিণত হওয়া নিখিল রায় শুধু স্ত্রী চিত্রার দেওয়া চিঠি প্রতিনিয়ত পৌঁছে দিয়েছে বিনায়কের হাতে। চিত্রার চিঠির জবাবে নিখিল রায় চিঠির জন্য অপেক্ষা করেছে, স্ত্রীর হাতে পৌঁছে দিয়েছে পরপুরুষ বিনায়ক সরকারের লেখা চিঠি। এহেন স্বামীর উপস্থিতিতে চিত্রা রায় বিনায়ক সরকারের ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টায় মত্ত। তাই বিনায়কের পার্টিতে নিখিলের আমন্ত্রিত হবার কারণটি তার কাছে অস্পষ্ট। জ্যাঠামশাই এর পছন্দ করা পাত্র নিখিলকে বিবাহ করে সে পরিতৃপ্ত নয়, সে চায় জীবনান্তর। চিত্রার বিশ্বাস বিনায়কের মধ্যেই সে লাভ করবে জীবনের পরিপূর্ণতা। ককটেল পার্টির ভিড়ে নিখিল রায় এর মুখটি ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে যায়, তখনও চিত্রা ফিরে তাকাতে পারেনা তার পূর্বজীবনের দিকে। তার চোখে বারংবার বিদ্যুৎ ঝলকে ওঠে। তার রূপে মুগ্ধ বিনায়কের সঙ্গে এক টেবিলে বসে জীবনকে পালটে নিতে চায় সে। আসরের অন্যদিকে তখন নিখিল রায়কে অভ্যর্থনা জানায় বিনায়কের স্ত্রী মৃদুলা। এক মিনিটের জন্য আসরের সব 'লাইট' নিভে গেলে সে মুহূর্তে যেন চিত্রার চোখের সমস্ত বিদ্যুৎ স্থির হয়ে যায়। বিদ্যুতের আলোয় বিনায়ককে সে জয় করে নিতে চেয়েছিল অথচ চিত্রা জানতেই পারেনি অনেক " ক্ষোভের গভীরে সেই বেদনার বিদ্যুৎ আজ জ্বালা হারিয়ে একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছে।"(পৃ.৩২৭) তাই একদিন নিখিলের ভালোবাসাকে, বিশ্বাসকে হেলায় তুচ্ছ করে গরবিনীর মুকুট মাথায় তুলে নিতে চেয়েছিল। ভুল করেছিল চিত্রা। স্বামী নিখিলের প্রতি মৃদুলা সরকারের আকর্ষণ যেন তার সেই বিদ্যুৎময়ী চোখের দৃষ্টিকে স্থির করে দিয়েছে। নিমেষের মধ্যে তার সকল অহংকার চূর্ণ হয়ে গিয়েছে, সকলকে চমকে দিয়ে বিনায়ক সরকারকে নয়, স্বামী নিখিল রায়কে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেছে সে। বিনায়ক সরকারকে বিদ্যুতের ঝলকে মোহাবিষ্ট করতে চেয়েছিল চিত্রা রায়। এমনকি বিনায়কও চিত্রার মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছিল বিদ্যুতের আভা। অথচ নিখিল রায় এর প্রেম কখন যে চিত্রার চোখের বিদ্যুৎকে স্থির করে দিয়েছে তা তারা জানতেই পারেনি। তাই যখন মৃদুলা সরকারের আহ্বানকে তুচ্ছ করেছে নিখিল, তখনই চিত্রার মধ্যে জেগে উঠেছে দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃত অর্থ। উজ্জ্বলতাকে ত্যাগ করে প্রকৃত বিদ্যুতের রূপে আকৃষ্ট হয়েছে চিত্রা। বিনায়ক সরকার ও তার স্ত্রী মৃদুলা তাদের দাম্পত্য

জীবনের বাইরে এক খেলায় মেতেছিল। বিনায়ক চেয়েছে মৃদুলা নয় অন্য কোন নারীর মধ্যে শান্তি পেতে, মৃদুলাও একইভাবে পর-পুরুষের মধ্যে জীবনকে পেতে চেয়েছে। চিত্রা রায়ের মোহ ভেঙ্গেছে এতদিনে। এবার বুঝতে পেরেছে যে পুরুষধরার খেলা সে খেলে চলেছে সেটা জীবন নয়, খেলা মাত্র। আচমকা তার মোহ ভাঙতেই সে ফিরে এসেছে স্বামীর কাছে, স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেছে পার্টি থেকে। অথচ নিখিল রায় পূর্বেই স্ত্রীর এই মোহমুগ্ধতাকে বুঝতে পেরেছিল, শুধুমাত্র দাম্পত্য জীবনটিকে হারাতে চায়নি বলে স্ত্রীর বশীভূত হয়েছে, এবারে তারা দুজনেই খুঁজে পেয়েছে প্রকৃত জীবনের অর্থকে। নারী যখন তার রূপ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন তখন তার ভালোবাসাকে নিজেই বুঝতে পারেনা। বরং শুধুমাত্র রূপজ মোহের পেছনে ধাবিত হয়। কল্পনায় গড়া জগতে সেই রূপ তাকে ভোলায় মাত্র, বাস্তবের কঠিন কঠোর সংস্পর্শে এসে নারী তার ভুল বুঝতে পারে, তার কাছে বাহ্যিক সৌন্দর্য তখন আভরণ উন্মোচন করে মেলে ধরে আত্মিক সৌন্দর্য।

সুবোধ ঘোষ সুন্দরম্ গল্পে কুৎসিত নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্যের আড়ালে দেহের অভ্যন্তরীন সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন, তারই ভিন্ন রূপ 'চোখ গেল' গল্পে। নর-নারী সম্পর্কের মাঝে এই আপাত সৌন্দর্য বিষয়টি অনেক সময়ই দেওয়াল তুলে দেয়, তখন সম্পর্কগুলি যেন ফাঁপা এবং মনুষ্যত্ববিবর্জিত অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকে। তাদের আত্মিক মিলনের মৃত্যু ঘটে যায়, যাকে পুর্নজীবিত করা প্রায় অসম্ভব ঘটনা। অপরাজিতা তার ভালোবাসাকে দ্বিধা বিভক্ত করতে চেয়েছিল। হিরন্ময় ও কিংশুক দুজনের কাছে তার সত্তাটিকে যেন দুটি খণ্ডে বিলিয়ে দিয়েছে-অপরা এবং জিতা। এই দ্বিখণ্ডিত মানবিক সত্তা নিয়ে অপরাজিতা ভালোবাসতে চায়, তাই সে বুঝতে পারে না, কার ভালোবাসায় সে প্রকৃত সুখী হতে পারে। কিংশুকের কাছে সে পায় তার রূপের বন্দনা, সে মুহূর্তে কিংশুককেই পেতে চায় জীবনে। কিন্তু পাথরের চোখ নিয়ে হিরন্ময় এসে যখন শোনায় "তুমি মহিয়সী" — তখন তার সিদ্ধান্ত মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায়। চক্ষুহীন হিরন্ময়কেই বিবাহ করে। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতেই অপরাজিতার সেই মোহ ভেঙে যায়। প্রতিবেশীদের নানা কটূক্তি তাকে মহিয়সীর আসন থেকে এক লহমায় টেনে নামিয়ে আনে। আর তখনই তার মনে হয় হিরন্ময় নয়, কিংশুকই তার ভালোবাসার জন। ডানাকাটা পাখির মত সব গৌরব হারিয়ে এক ব্যাধের দুটো পাথুরে চোখের সামনে তার জীবনটাকে ফেলে রাখতে গিয়ে হাপিয়ে ওঠে। চিঠিতে আমন্ত্রণ জানায় কিংশুককে। এই অসহায় জীবন থেকে মুক্তি পেতে কিংশুককে সে আহ্বান জানিয়েছে, আর তখনই তার কাছে প্রকাশিত হয় চক্ষুহীন হিরন্ময় তার পাথরের চোখ দিয়ে নয় অন্তরের সমস্ত আলোক নিয়ে অপরাজিতার নারী হৃদয়কে অনুভব করতে পারে। এমনকি তার অসহায় অবস্থা ও হিরন্ময়ের কাছে অজানা নয়। — অপরাজিতা তার — "ভাসা ভাসা চোখের জ্বালার সম্মুখে যেন সুন্দর কতগুলি খোসা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে অপরাজিতা, আর নিজের অনাবরণ রূপের আত্মাটাকে দেখছে হিরন্ময়ের চোখের উপর চোখ রেখে।"(পৃ.৩০২) — এই

মুহূর্তে অপরাজিতা সত্যিই মহিয়সী হয়ে উঠেছে। 'রাজা' নাটকের সুদর্শনার মত সেও তার সকল অহংকার বিসর্জন দিয়ে প্রকৃত প্রেমকে জেনেছে। বিচিত্রময়ী নারীর প্রেমও বিচিত্র। পুরুষকে তারা যেমন ঠকাতে পারে, তেমনি তাদের প্রেম দিয়ে গড়ে তুলতে পারে মধুর, এক সম্পর্ক। 'চোখ গেল' গল্পে রূপময় পুরুষের প্রতি আসক্তি থাকলেও প্রেমের কাছে তাকে পরাজিত হতে হয়েছে।

'ঠগিনী' গল্পে সুবোধ ঘোষ নর-নারী সম্পর্কের এমনই একটি দিক উদ্‌ঘাটন করেছেন। বাবা-মেয়ে দুজনেই মূলত প্রতারক। বিভিন্ন স্থানে তারা ভিন্ন পরিচয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং প্রতারণা করে ঐ অঞ্চলের লোকেদের। তাদের এই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারিত হলে ভাটপাড়ার রমেশ বিজয় বাবুর কন্যা তরুণী করবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কখনো সুধা, কখনো সুনয়না, আবার কখনো বা মাধবীর পরিচয়ে যে করবী এতকাল ঠকিয়ে এসেছে বহু পুরুষকে সেই নারীই এবার মুগ্ধ করে রমেশকে। এই মুগ্ধতা রমেশের দিক থেকে ভালোবাসায় পরিণত হয়। করবীর ধূর্ততা রমেশের অন্ধ ভালোবাসার কাছে স্পষ্ট নয়। করবী বিগত তিনবারের মত এবারও নিরীহ বিশ্বাসী একজন মানুষের জীবনকে মিথ্যা বাসরঘর আর ভুয়া ফুলশয্যা দিয়ে নির্মমভাবে ঠকাতে চায়। পিতার সঙ্গে পূর্ব পরিকল্পনা মত রমেশের সঙ্গে বিবাহের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলে। করবীর প্রতি ভালোবাসার খাতিরে বিয়ের খরচ বাবদ দু'হাজার টাকা ঋণ করে রমেশ। একটি শুভ লগ্নে রানাঘাটের পাড়ায় ক্ষুদ্র আঙিনায় রমেশের সঙ্গে করবীর বিবাহ হয়ে যায়। রমেশেরই দেওয়া দেড় হাজার টাকার গয়না পড়িয়ে মেয়েকে বিদায় দেবার সময় ডুকরে কেঁদে ওঠে করবীর বাবা বিজয়বাবু। যদিও এই মিথ্যে কান্না এর আগে আরো তিনবার কেঁদেছিল বিজয়বাবু। বিয়ে বাড়ির আত্মীয় পরিজনের হইচই এর মাঝে করবীর ঠগিনী আত্মা কেঁপে ওঠে। প্রকাশ করতে চায় তার প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু বারংবার রমেশের ভালোবাসার সঙ্গে তার প্রতারক আত্মার সংঘাত বাধে। এক রাত্রির জন্য রমেশের গৃহিনী রূপে এসে রমেশের সংসারে তার হাতের চুড়ি বেজে উঠেছে। ধীরে ধীরে তার হৃদয়টি বাধা পড়ে গেছে রমেশের কাছে। বাধ্য হয়েছে নিজের হাতে রান্না করে রমেশকে খেতে দিতে এবং রমেশের সঙ্গে একই থালায় খেতে বসেছে। রমেশের বিশ্বাস এবং ভালোবাসায় করবীর অন্তরের সুপ্ত নারী হৃদয় জেগে ওঠে। সে চিৎকার করে বলে — "আমি তোমাকে ঠকাতে এসেছি। আমি তোমার স-জাত নই, আমি করবী-নই, আমি কুমারী নই। আমি হলাম ..."। (পৃ. ২৬৩) — ভয়ঙ্কর প্রতারক পিতার ঠগিনী কন্যা করবীর ভেতরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত নারী তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে লাভ করতে চায়। স্বামীর প্রেম প্রীতি ভালোবাসা নারী জীবনকে যে পরিপূর্ণতা দান করে করবীর এতদিনকার ঠগিনী সত্তা সেই উপলব্ধিতে পৌছয়। নর-নারী সম্পর্কের এই রহস্য ঘন জটিলতা আবিষ্কারে সুবোধ ঘোষ অত্যন্ত কুশলতার দাবি রাখেন। আর একারণেই তাঁর বিখ্যাত রচনা 'ভারত প্রেমকথা'র 'পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা' কাহিনির বিষয়বস্তুতেও নারীর প্রতারণা এবং পুরুষের সংস্পর্শে নারীর হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার লক্ষ্য করা যায়। উভয় কাহিনির সাদৃশ্য 'পুরাণের পুনর্জন্ম ঃ ভারত

প্রেমকথা' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। উক্ত অধ্যায়ে এটুকু বলতে হয় যে, সুবোধ ঘোষের চিন্তা চেতনায় নর-নারীর প্রেম এবং তাদের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি বিষয়টি নানাভাবে আলোচিত হয়েছে।

'ঠগিনী' গল্পের বিপরীতে অবস্থান করছে 'সবলা' গল্পটি। "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/ কেহ নাহি দিবে অধিকার/ হে বিধাতা?" [১১] 'মহুয়া' কাব্যের 'সবলা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নারীর স্বাধিকারের পথ এবং একই সঙ্গে নারীকে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল করে অঙ্কন করতে চেয়েছেন। নারীর প্রার্থনা — "হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা/ রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা/ উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের' পরে/ জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে/ কণ্ঠ হতে/ নির্বারিত স্রোতে।" [১২] 'সবলা' কবিতার এই সবাক এবং স্বাধিকারে উজ্জ্বল নারীকে পাওয়া যায় সুবোধ ঘোষের 'সবলা' গল্পে। মোড়ল এলাচি ডোমের মেয়ে টুকিয়া ভালোবেসেছে ভিন্ন জাতের ছেলে মঙ্গলকে। জংলী মঙ্গলের এই প্রেমকে স্পর্ধা মনে করে ডোম জাতের লোকেরা। তাই তারা পঞ্চ বসিয়ে মোড়ল ও তার কন্যাকে শাসিয়ে যায়। মদের লোভে এলাচি ডোম পঞ্চের চোখ রাঙানিকে ভয় করে। কিন্তু টুকিয়া-মঙ্গল ভালোবাসার পথে কোন বাধাই মানে না। জংলী মঙ্গলকে নানা কাজের উপায় বলে দিয়ে তাকে সামাজিক করে নেবার চেষ্টা করে টুকিয়া। মঙ্গলের রোজগারের পথে আইনী বাধা আসে, ধরা পড়ে সে। ডোম গাঁয়ের সমস্ত উষ্মা সেদিন স্তিমিত হয়ে যেতে থাকে। টুকিয়ার পাণিপ্রার্থীরা সকলেই একে একে এলাচির কাছে প্রস্তাব রাখে। গাঁয়ের সংস্কারকে তুচ্ছ করে টুকিয়া তার জীবনের প্রেমকে সত্য করতে চায়। পঞ্চকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জাতের বাইরে বেরিয়ে পড়ে — "নে বুড়ো, খুব হয়েছে, থাম এবার, যত মদ খাবি, যত তামাকু খাবি সব দেব। তোর আর পঞ্চকে অত ভয় করতে হবে না। ... ওদের জবাব দিয়ে যে।" (১৭৬ পৃ.) তার রক্ত মাংস মজ্জায় মিশে যে সন্তান বড় হয়ে উঠেছে সে যে তার ভালোবাসার প্রাপ্তি মঙ্গলের সন্তান। তাই তার প্রাণের কঠোর গর্ব হঠাৎ প্রতিজ্ঞার আগুনে জ্বলে ওঠে। মঙ্গলের ছাড়া পাবার দিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রথমেই রূঢ় সম্ভাষণ জানায় টুকিয়া — "রোজগার করবি তো কর। নইলে আমার আশা ছাড়।" (১৭৬ পৃ.) জংলী মঙ্গলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, ভদ্র সমাজে কাজের সন্ধান করতে গিয়ে তারা জানতে পারে সেখানে তারা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত, ব্রাত্য। তাদের প্রত্যেকটি অভিযান যখন নিদারুন নিস্ফলতায় ধূলোয় লুণ্ঠিত হয়ে যায় তখন টুকিয়ার অভিমান আহত হয়। "দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন/কেন নাহি করি আহরণ/প্রাণ করি পণ।" (সবলা, ৩৪ পৃ.) টুকিয়াও তার বহু সাধনার মঙ্গল ও তার সন্তানকে পেতে নিজের প্রাণকে পণ করতে দ্বিধা করে না। টুকিয়া ও মঙ্গল ফিরে আসে অনেক সিকি আধুলি টাকার স্পর্শ সুখ নিতে নিতে। টুকিয়ার ভালো লাগে এই ভেবে — "একান্তভাবে তারই দাক্ষিণ্যের ওপর যাদের নির্ভর, এমন দুজনকে সে দুর্গতির হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে। ভাঙা সংসারকে সে আবার নিজের মহিমায় জুড়ে দিয়েছে। বুড়ো সুখী, মঙ্গল সুখী, সে সুখী, আরও একজন-সেও আজ তার রক্তের অন্ধকারে সুখ সুপ্ত।" (১৭৮ পৃ.) টুকিয়া মনে প্রবল জোর

অনুভব করে। যে কোন ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে মঙ্গলকে বাঁচাতে হবে তার। ঠিক সেই মুহূর্তে পুরনো দাগী আসামী মঙ্গলের ঘরের দরজায় কড়া নাড়ে নিয়তির কঠিন পরিহাস। স্বামীকে বাঁচাতে কনস্টেবলের ডাকে বাইরে বেড়িয়ে আসে টলায়মান পায়ে বেসামাল টুকিয়া। শুধু তাই নয়, মঙ্গলকে বাঁচাতে টুকিয়া তার অঙ্গে ধারণ করে "প্রলুব্ধ হাতের ক্রূর আকর্ষণ"। ঘোরের মধ্যে টুকিয়া বুঝতে পারে মঙ্গল তার টাঙ্গি নিয়ে বেরিয়ে এলে টাঙ্গির এক আঘাতে কনস্টেবল খুন হয়ে যাবে, তার ফলে মঙ্গলকে পুনরায় হাজত বাস করতে হবে একারণে টুকিয়া তার সমস্ত লজ্জা, ভয় দূরে ঠেলে প্রাণ পণে কনস্টেবল দুজনের হাত ধরে বলে — "শীগগির চলো এখান থেকে। একটু দূরে, আরো অন্ধকারে।"(পৃ.১৭৯) — এদিকে গ্রহণ লাগা রাত্রির গ্রহণ ছেড়ে গেলে "চারদিকে ফুটে ওঠে নতুন শুক্লমার স্ফূর্ত শোভা।"(পৃ.১৭৯) — চাঁদের এপিঠে যেমন আলো, অন্যপিঠে তেমনই কলঙ্কিত। টুকিয়াও তার শরীরে সমস্ত কলঙ্ক লেপন করেও তার প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। ভোরবেলায় যখন সে ঘরে ফিরে আসে তখন মঙ্গল 'অঘোরে ঘুমোচ্ছে' — এই নিশ্চিন্ততার মধ্যে তাদের প্রেমের সার্থকতা। আবারও মনে পড়ে রবীন্দ্র কবিতার অংশ বিশেষ — "কভু তারে দিবনা ভুলিতে/ মোর দৃপ্ত কঠিনতা।/ বিনম্র দীনতা/ সম্মানের যোগ্য নহে তার,/ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।" (৩৪-৩৫ পৃ.) নারীর অহংকারের একমাত্র মূল যে প্রেম তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সে তার প্রাণকে বিসর্জন দিতে পারে। দৈহিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে একে অপরের প্রকৃত অবলম্বন হয়ে উঠতে পেরেছে, নর-নারী সম্পর্কের গভীরে প্রবেশ করে গল্পকার সেই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের তিন সঙ্গী পর্বের গল্প 'ল্যাবরেটরির' সোহিনীর মত টুকিয়াও মঙ্গলের সহধর্মিনীর ব্রত নিয়েছে, যে সম্পর্কের মাঝে শরীর কোন ভূমিকা নেয়নি বরং সম্পর্ক শারীরিকতার ঊর্ধ্বে পৌছতে পেরেছে।

'দুঃসহধর্মিনী' গল্পে ধীরার ব্রত ছিল সহধর্মিনী হবার। অন্যদিকে স্বামী কমলেশ তার সহধর্মিনী রূপে পেতে চায় সুন্দরী পাত্রীকে, এমনকি মূর্খ হলেও সেরকম পাত্রীতে তার কোন আপত্তি নেই। লাজুক মেয়ে কমলেশের চোখে দুঃসহধর্মিনী। বাসরঘরেই ধীরাকে কমলেশ বুঝিয়ে দিয়েছে গ্রাম্য সংস্কৃতি বা কালচারকে বহন করে জীবনে বড় হওয়া যাবে না, তাই স্ত্রী ধীরাকেও বিলাতী ভঙ্গিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। ধীরাও কমলেশকে বোঝে এইভাবে — "জীবনটাকে মস্ত বড় করে পাওয়ার জন্য বিরাট একটা তৃষ্ণা ছড়িয়ে আছে সে মনে।" (পৃ. ৩৪৩) তাই সেও স্বামীর সহধর্মিনী হয়ে বেঁচে থাকতে চায়। দাম্পত্য জীবনে চলার পথে ধীরা ক্রমশ কমলেশের ইচ্ছাপূরণের পাত্রী হয়ে ওঠে। কমলেশের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে বড় সাহেবকে সন্তুষ্ট করতে হবে, তাই সুন্দরী ধীরা হেসে হেসে স্প্যানিস মদ তুলে দেয় তার হাতে। স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে ব্যবহৃত হচ্ছে জেনেও তাকে যেন নিয়তির মতো অবধারিত বলে মেনে নেয় ধীরা। এমন জীবন যাপন করতে কখনো কখনো ঘৃণা বোধ জাগে তার, তবুও তার মনে ভীষণ যন্ত্রণাকে চেপে রেখে সে তার ব্রত পালন করে। ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে গিয়ে কখন যে স্বামী তার স্ত্রীকে

হারাতে বসেছে সেদিকে খেয়াল হয়নি কমলেশের। গল্পের চরম পরিণতিতে বড় সাহেব রাওয়ের হাতে ধীরা প্রায় বিকিয়ে যাচ্ছে দেখে তার টনক নড়েছে। সাবধানী ধীরা সচেতন ভাবেই রাওয়ের কাছ থেকে স্বামীর প্রয়োজন টুকু মিটিয়ে নিয়েছে, তাই তার বারো বছরের প্রতীক্ষিত প্রাণ বিশ্বাস করতে চায় — " তার মনের ভেতর যেন শাঁখা সিঁদুর পরে এক মূর্খ বিশ্বাসের নারী ধৈর্য ধরে বসে আছে এখনো।" (পৃ.৩৫৫) — এই প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে চায়। এদিকে কমলেশের স্কীমটা মঞ্জুর করার ভার রাওয়ের হাতে। ধীরাও স্বামীর বন্ধ চোখ খুলে দিতে জোর করেই যেন রাওয়ের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে চায়। প্রায় নেশাখোরের মত স্ত্রীর সম্মান নিজের সম্মান না দেখে একের পর এক পর পুরুষের লোভের মুখে ঠেলে দিয়েছিল ধীরাকে। কিন্তু এবার তার চেতনার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। ধীরাও তাকে চরম আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় সংযত রূপে রাওয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, শুধু তাই নয় রাওয়ের সঙ্গে রাঁচী যাবার প্রস্তাবে সম্মতি দেয়। কমলেশ এই প্রথম বাধা দিতে গেলে ধীরার উক্তি — "শেষে রাও আমাকে একটা অসভ্য মনে করুক আর কি! ছিঃ!" (পৃ.৩৫৬) — কমলেশ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ধীরাকে ফেরাতে চাইলে পাথুরে মূর্তির মধ্যে ধীরা আবিষ্কার করে — "কমলেশের কপালে বিন্দু বিন্দু জল, লাল চোখের দুই কোণে দুটো বড় বড় জলের ফোঁটা।" (পৃ.৩৫৮) — এরই অপেক্ষায় ধীরা এতদিন দিন গুনছিল। এবারে তার ব্রত সার্থক হল। তাদের সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং দাম্পত্যের দুঃসহ যাপনের সমাপ্তি হল। এই প্রথম কমলেশ আবিষ্কার করল প্রেমময়ী ধীরাকে। সেও বহু দুঃসহ মুহূর্ত যাপনের বিনিময়ে প্রকৃত সহধর্মিনীর সম্মান লাভে সমর্থ হয়েছে।

"সুবোধ ঘোষের গল্পে প্রেম আসে নিঃশব্দ চরণপাতে, শিউলিফুলের মতো, জ্যোৎস্নার মতো, ভোরের মতো।" [১৩] 'চিত্তচকোর' গল্পে এই প্রেমেরই নিঃশব্দ পদপাত লক্ষ্য করা যায়। 'চকোর' শব্দের আক্ষরিক অর্থ পক্ষিবিশেষ, এই পাখিটি জ্যোৎস্না পান করে তৃপ্ত হয় বলে কথিত আছে। নর-নারী সম্পর্কের মধুরতম দিক দেখাতে গল্পকার এই বিশেষ পাখিটির প্রতীকী ব্যঞ্জনায় গল্প রচনা করেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনিমার জন্য সুপাত্রের সন্ধান দিয়ে তার বাবা নিবারণ বাবুর কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে মীরা পিসিমা। জি.বি. কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের কনট্রাকটর সৌরভ সরকার, কলকাতার কমপিটিশনের বাজারে সৌরভের মত পাত্র লাভ করা সম্ভব হবে জেনে অনিমার মা বাবা তাদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। মীরা পিসির চিঠি থেকে অনিমারা জানতে পেরেছে সৌরভকে পেতে হলে বহু সাধ্য সাধনার দরকার। সেইমতই অনিমারা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সৌরভের আগমনের নির্দিষ্ট দিনে। সকলে মিলে সাদরে অভ্যর্থনা জানানোর পর অনিমা তার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। মন দিয়েছে একে অপরকে। কিছুদিন পর প্রকাশিত হয় এক চরম সত্য-সৌরভ নয়, ঐ দিন সৌরভের পরিবর্তে এসেছিল তারই স্টেনো টাইপিস্ট বিনয় দত্ত। ভুল সংবাদে অনিমারা যে ভুল করে বসেছে তার সংশোধনও সম্ভব। মীরাপিসির কথামতই সৌরভকে অভ্যর্থনা

জানানো হয়। সৌরভও সহজ ভাবেই অনিমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাধ সাধে অনিমার প্রেম। ভুল করে বিনয়কে সৌরভ ভেবে যে প্রেম নিবেদন করেছে অনিমা, সে প্রেম তো মিথ্যে নয়। বিনয়েরই প্রেমে তৃপ্ত হয়েছে অনিমার হৃদয়, তাই সৌরভের আগমনে লজ্জিত বিনয় যখন চলে যেতে চেয়েছে তখন অনিমার প্রেম ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে বিনয়কেই। বিনয়ের প্রেম লাভের জন্য চকোরেরই মত তার চিত্ত জ্যোৎস্না পানের বাসনা নিয়ে ধাবিত হয়েছে। উচ্চপদস্থ সৌরভকে নয়, তার ভালোবাসা বিনয়কে ঘিরেই। প্রেম যেন এক অলৌকিক যাদুমন্ত্রের মতো। সৌরভকে যেদিন ছলাকলায় ভোলাতে প্রস্তুত হয়েছিল অনিমা সেদিন সে জানতোও না প্রেম কাকে বলে। বিনয়কে ঘিরেই তার মনে প্রথম প্রেমের জাগরণ। সেই প্রেমকে মূল্য দিতে দ্বিধা করেনা অনিমা।

প্রেমের বিচিত্র রূপ এবং নারীর মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে সুবোধ ঘোষ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। 'ভোরের মালতি' গল্পের মালতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারী প্রেমের একটি দিক প্রকাশিত। বিশ বছর আগে মালতির স্বামী সন্ন্যাস নিয়ে ত্যাগ করেছিলেন সংসারের মোহ। সেদিন কিন্তু তিনি স্ত্রীর প্রেম ভালোবাসা এমনকি শ্রদ্ধাকে সম্মান দিতে পারেননি। মালতি বিশ বছর ধরে ত্রিশ বছর বয়স্ক স্বামীর সেই ছবিকে পূজা করে আসছে যেখানে স্থির হয়ে আছে তার স্বামীর ত্রিশ বছরের যৌবন। কিন্তু বিশ বছর পর যেদিন স্বামী ইন্দুপ্রকাশ ফিরে এসেছে সেদিন মালতি নতুন করে লালপেড়ে শান্তিপুরী শাড়িকে সহ্য করতে পারে না। এমনকি স্বামীর মুখোমুখি হয়ে এতদিনের ধ্যানতন্ময়তা মুহূর্তে ভেঙে যায়। স্বামীর ফোটোকে যেভাবে পূজা করেছে এতকাল, স্বামীকে কাছে পেয়ে সে শ্রদ্ধাটুকু করতে পারে না মালতি। ইন্দুপ্রকাশের কাছে মালতির মনের প্রকৃত রহস্য কিন্তু চাপা থাকে না। পরদিন সকালে চলে যাবার সময় তিনি প্রকাশ করেন — "স্বামীকে নয়, তুমি ত্রিশ বছর বয়সের একটি ছেলেকে আজও পুজো করছো মালতী।" (পৃ. ২২১) রাতের স্তব্ধতা কেটে গিয়ে ভোরের আলোয় দাঁড়িয়ে মালতীর ভালোবাসা ভোরবেলারই স্বচ্ছতা পায়। তাদের দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যে ব্যবধান রচনা করেছিল ইন্দুপ্রকাশের সন্ন্যাস জীবন, এতকাল পর মালতীর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। সন্ন্যাস জীবনের মাঝে যে জীবন সত্যকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন ইন্দুপ্রকাশ, সে ভুল ভেঙে গেলে তিনি উপলব্ধি করেন দাম্পত্য জীবনের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত জীবনের রূপ।

দাম্পত্য জীবনের প্রেম সুবোধ ঘোষের গল্পে নানা ভাবে চর্চিত হয়েছে। নর-নারী তাদের সম্পর্ককে আবিষ্কার করে বিচিত্র রূপে। এই আবিষ্কারই করেছে 'বৈদেহী' গল্পে মল্লিকার স্বামী বিকাশ মিত্র। রুগ্ন শীর্ণ শরীরের অধিকারিনী মল্লিকার শরীরকে ভোগ করে তার স্বামী। শিক্ষিত, ভদ্ররুচির পাত্র বিকাশ মিত্র মল্লিকার সঙ্গে প্রথম মিলনের রাতটিতে ফুলশয্যার ফুলগুলিকে সরিয়ে দিয়ে নিজের লোভটুকুকে জাগিয়ে রেখেছিল। আলিপুরের প্রকাণ্ড বাড়িতে 'কঠিন ইস্পাতে ঢাকা একটি মানুষ' তার বিদ্যা বুদ্ধি আর

জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে তার কর্মময় জীবনের ব্যস্ততাকে বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার কার্পেটের ওপর দিয়ে সরীসৃপের মত হিস্ হিস্ শব্দ ছুটে আসে মল্লিকার ঘরের দিকে। সরীসৃপেরই মত মল্লিকার দেহের স্পন্দনকে দুঃসহ এক পাষাণভারে চূর্ণ করে দিয়ে যায় পুরুষের শরীর। নারী মনের কোন সাধ আহ্লাদ অনুসন্ধান করার ইচ্ছে বা সময় কোনটাই নেই বিকাশের। মল্লিকা তার নিঃশ্বাসের যন্ত্রণা বুকের ভেতর চেপে রেখে সহ্য করেছে এক লোভী মনের প্রবল এক লোভ। তাদের ভালোবাসাহীন দাম্পত্য জীবনেই মল্লিকা সন্তানের জন্ম দেয়। তিন বছরের মধ্যে দুটি সন্তানের জননী হয়েও মল্লিকার মনে কোথাও মাতৃত্বের আনন্দ উৎসারিত হয় না। নর-নারীর বিবাহিত জীবনের পরিপূর্ণতা আনে সন্তানের জন্ম, কিন্তু মল্লিকার সন্তানেরা যেন চক্রান্ত করে মল্লিকার সমস্ত শক্তি নিষ্পেশিত করে নিয়েছে। উপরন্তু শাশুড়ির মৃত্যুতে তার কোলের সন্তানটিও মল্লিকার আশ্রয়ে বেড়ে উঠছে। এরপরও স্বামী বিকাশ মিত্রের লোভী আত্মার কাছে রেহাই নেই মল্লিকার। স্বামীর বিশ্রী আচরণে চরম ঘৃণা জেগে ওঠে মল্লিকার। মল্লিকার এই উদ্ধত্য মেনে নিতে পারেনা তার স্বামী। বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়, মল্লিকাও মুক্তির লোভে চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেদিন রামজামাই বাবু ও পচার মা মল্লিকাকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে, সেই রাতে মল্লিকার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিকাশ মিত্রের আহত পৌরুষ স্ত্রীর ওপর প্রতিশোধ নিতেই কোন এক শরীরিনীর আহ্বানে সাড়া দিতে নিশাচরের মত যাত্রা করে। রামজামাই বাবুর দেওয়া বৈদেহী নামের অর্থকে লজ্জা দিয়ে মল্লিকা তার রুগ্ন শরীরের অহঙ্কারে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়েছে। স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে নয়, বাধা দিতে নয়, স্বামীর অহঙ্কারকে চূর্ণ করতে চায় মল্লিকা। মল্লিকা নামক মেয়ের মনের সন্ধান করেনা যে পুরুষ, একমাত্র তার দেহের প্রতি তার সমস্ত লোভ লালসাকে জাগিয়ে রাখতে চায়, সেই স্বামীর মনে শেষ পর্যন্ত ভালোবাসা জাগাতে পেরেছে মল্লিকা। স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করে মল্লিকা বাড়ির কোনো একটি ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে, বহু সন্ধানে বিকাশ যখন স্ত্রীকে উদ্ধার করেছে তখন তার নিজেকে — " যেন একটা আধমরা দুর্বল ও অসহায় শরীরের ছায়া বলে মনে হয়।" (১২৭ পৃ.) নিছক ঠাট্টা তামাশার সম্পর্কের খাতিরে রামজামাইবাবু শ্যালিকা মল্লিকার নাম দিয়েছিল বৈদেহী। এ নামের আক্ষরিক অর্থকে মিথ্যে প্রমাণ করে বিকাশ যেন মল্লিকার মনকে নয় গুরুত্ব দিয়েছিল শরীরকে। সমস্ত বিষয়টিকেই গল্পকার সুবোধ ঘোষ ভেঙ্গে দিয়ে যে সত্যকে প্রমাণ করেন তা হল শরীর নয়, নর-নারীর সম্পর্কের একেবারে মূল শিকড়টি আসলে প্রেমের মধ্যেই। তাই শেষ পর্যন্ত বিকাশ তার কাম প্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে ফিরে পেয়েছে মল্লিকা ও তার ভালোবাসাকে।

পুরুষের চোখে নারীর অবস্থানটি ঠিক কোথায় এ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে গিয়ে সুবোধ ঘোষ নর-নারী সম্পর্ককে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। 'অর্কিড' গল্পটিও এই তত্ত্বেরই একটি দিক। বোটানিস্ট প্রণব বসু বিদেশ থেকে নানা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ফিরে আসে। প্রথাগত চাকরি না নিয়ে

তার পছন্দের গ্রিন-হাউস, ল্যাবরেটরি আর লিলিপগুএর মধ্যে ফুল ও লতাপাতার জীবন রহস্য গবেষণায় দিন কাটায়। এমনকি করুণার সঙ্গে তার বিবাহিত জীবনেও এই ল্যাবরেটরি বিরাট এক বাধা। প্রণব বসু যেমনভাবে লতাপাতার জীবন রহস্য জানতে আগ্রহী, তেমনভাবে নারী মনের রহস্য জানতে উৎসাহী নয়। করুণাও জানে স্বামীর কাছে তার আশা করার মত কিছু নেই। তাই করুণাই সংসার সমুদ্রের নাবিক হয়ে পুরো সংসারের হাল ধরে বসে। তার জুয়েলারি বাক্সো থেকে সমস্ত গয়না এক এক করে অনন্তের পথে যাত্রা করে, কিন্তু তবু করুণা হাল ছাড়ে না। অন্যদিকে প্রণব যেমনভাবে সংসারের ব্যবহারিক জীবনের প্রতি উদাসীন, তেমনি ভাবেই উদাসীন স্ত্রীর প্রতিও। কিন্তু নাবিকের হালে প্রচণ্ড এক ঝড়ের বাতাস লাগে। তার শেষ গয়নাটি যেদিন নিঃশোষিত হয়ে যায় সেদিন তাদের শুভাকাঙ্ক্ষি গুণাকর এর কাছে টাকা চাইতে বাধ্য হয় করুণা। গুণাকর কিন্তু সেদিন বন্ধুত্বের সম্পর্ককে অতিক্রম করে দুঃসাহসিক হয়ে উঠেছে। গুণাকরের এই পরিবর্তন করুণা এবং প্রণব বসুর মাঝে ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। করুণা যেদিন স্বামীর সমস্ত পাগলামির কাছেই নিজেকে সঁপে দিয়েছে। এমনকি সে আবিষ্কার করেছে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাস থেকেই প্রণব একটি নতুন অর্কিডের নামকরণ করেছে 'কালান্থিস করুণাইনা' - করুণার প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা থেকেই অর্কিডের এই নামকরণ। এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে প্রণব বসুর ভালোবাসা নারীর শরীরকে কেন্দ্র করে নয়, স্ত্রী করুণার প্রতি তার ভালোবাসা অনেকটাই বন্দনা বা স্তবের মত। সেকারণেই স্ত্রীর ভালোবাসার প্রতি তার এ শ্রদ্ধা।

মানুষ এই ভালোবাসাকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে জীবনের এক একটি খণ্ড থেকে গড়ে তোলে বৃহৎ পৃথিবী। ভালোবাসা ও প্রেম দিয়েই আমরা গড়ে তুলি এক একটি স্বপ্ন, এক একটি কাগজের নৌকা। আবার আমাদেরই ভুলে ভেঙে যায় সে সমস্ত অনুভবে গড়া স্বপ্নময় মূর্তি। আমরা নিজেরাই স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিই কাগজের নৌকা। সুবোধ ঘোষের 'কাগজের নৌকা' গল্পে জীবন প্রভাতের একটি খণ্ড স্মৃতিই এইভাবে ভেসে আসে। এক গ্রীষ্মের দুপুরে বাগানের অপরূপ মোহ গায়ে মেখে গল্পকথক বেড়াতে গিয়ে দেখেছেন পাঁচ বছর বয়সের একটি বাচ্চা ছেলে বাগানের ভেতর কোন কিছুর সন্ধান করছে। তার গতিবিধি লক্ষ্য করে সেই রহস্য সন্ধান যখন সম্ভব হল না তখন সরাসরি ছেলেটিকে ডেকে তিনি জানতে পারেন নাগেশ্বর আসলে তার অনেক দিনের খেলার সঙ্গিনী তিতিকে খুঁজছে। তারই কাছ থেকে জানা যায় পরিচারকের কন্যা তিতি আসলে মৃত, বাগানের কোন একটি অংশে তার মৃতদেহ পুঁতে রাখা হয়েছে। তিতির সন্ধান করে কোন লাভ নেই জেনেও নাগেশ্বর বিরহ বিদূর মুখে ঘুরে বেড়ায় তিতিকে পাবার ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে। নাগেশ্বর একটি কাগজের নৌকা তৈরী করে "খালের জলে নৌকাটিকে ছাড়া মাত্র বাঁশঝাড় থেকে একটা ব্যাকুল হাওয়ার দম্‌কা তরতর করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।"(পৃ.৫০) — পরিতৃপ্ত দৃষ্টি নিয়ে নাগেশ্বর তার কাগজের নৌকাটিকে দেখছে, যে নৌকাটি আসলে তার স্বপ্নময় স্মৃতিতে রচিত। সে যেন ফিরে পেয়েছে

গত শ্রাবণের কোন এক বর্ষণমুখর বিকালের অনুভূতিকে। সমাধিস্থা তিতি যেখানেই থাক, নাগেশ্বরের কল্পিত কাগজের নৌকা ভেসে বেড়ায় স্মৃতির কোণায় কোণায়, যেখানে তার খণ্ড খণ্ড অনুভূতির মিছিল ভিড় করে আসে। ছোট্ট তিতি ও নাগেশ্বর আসলে মানুষের জীবনের সূচনা লগ্নের প্রেম। যে প্রেমের শরীরী মৃত্যুর পরেও তার আত্মিক মৃত্যু ঘটে না, সে বেঁচে থাকে স্মৃতির মনিকোঠায়। যৌবন বা পরিণত বয়সে তারই খণ্ড রূপ কাগজের নৌকা হয়ে স্মৃতিতে ভেসে বেড়ায়। এও এক ভালোবাসার রূপ।

একসময় সার্কাস দলের সঙ্গে যুক্ত সুবোধ ঘোষ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লেখেন 'অঙ্গ দা' গল্প। ডেকান গ্র্যাণ্ড সার্কাসের মিস সুধালক্ষ্মী ঝুঁকি নিয়ে বিচিত্র খেলা দেখায়। খেলতে এবং খেলা দেখাতে হাফিয়ে ওঠে সুধালক্ষ্মী, আর সেই অবসরে জোকার দাশগুপ্ত উদ্ভট সজ্জায় নিজেকে পরিবেশন করে গ্যালারির সকলকে আনন্দ দেয়। সুধালক্ষ্মীর খেলা দেখে মুগ্ধদৃষ্টিতে। মাত্র ত্রিশ টাকা মাইনে নিয়ে দাশগুপ্ত যখন সার্কাস দলে হিসাব রক্ষকের কাজ নেয়, তখন সুধালক্ষ্মীই তার কানে উৎসাহের মন্ত্র পুড়ে দিয়েছে। হিসাব রক্ষক দাশগুপ্তকে সার্কাস দলে স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করে দেয় সুধালক্ষ্মী। এদিকে দলের অন্য এক কর্মী চিনাপ্পা সুধালক্ষ্মীর প্রতি আসক্ত, কিন্তু সুধালক্ষ্মীর গোপন প্রেম শুধুমাত্র দাশগুপ্তকে কেন্দ্র করে। দাশগুপ্ত যখন নীচে রিং এর মাঝখানে শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে তখন ওপরে চিনাপ্পা আর সুধালক্ষ্মী একে অপরের খুব কাছে এসে যায়। দাশগুপ্তের বুকের ব্যথাটা চিনচিন করে ওঠে, তার বুঝতে বাকি থাকে না — "দাশগুপ্তের স্বপ্নের ঘরে ডাকাত পড়েছে।"(পৃ.২৪৯) — ব্যথিত জোকার দাশগুপ্ত হাতে ভর দিয়ে প্রচণ্ড একটা ভল্ট খেতে গিয়ে রিং এর শক্ত মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে, নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত গড়ায়। আসল নকলের ব্যবধান ভুলে গিয়ে দর্শকেরা চিৎকার করে ওঠে 'নকলি খুন'। খাঁচার বাঘ কিন্তু তার আসল রক্তের গন্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। রঙিন শাড়ি পরিহিতা সুধালক্ষ্মী তার প্রেমময় স্পর্শ নিয়ে দাশগুপ্তের ক্ষত চেপে ধরে। চিনাপ্পাকে কেন্দ্র করে সুধালক্ষ্মীকে যেভাবে সন্দেহ করেছে দাশগুপ্ত, তার সেই সংশয়কে মিথ্যে প্রমাণিত করে বলে — "খেলা হলো খেলা। কিন্তু তাই দেখে কি ভয়ানক রাগ হয়ে পাগল হয়ে গিয়েছে আপনাদের জোকার।" (৪র্থ খণ্ড/২৫০ পৃ.) জোকার দাশগুপ্ত বুঝতে পারেনি সুধালক্ষ্মীর গোপন প্রেমকে। তাই খেলা দেখানোর সময় চিনাপ্পার সঙ্গে সুধালক্ষ্মীর ঘনিষ্ঠতা তার শরীরে জ্বালাময় কামড় বসিয়ে দিয়েছে। জীবনটা আসলে সার্কাসের খেলা, কিন্তু তার মাঝেই জীবনের সখ আহ্লাদ আনন্দ বেদনার স্রোত বয়ে চলে। এরই মাঝে নর-নারী খুঁজে নেয় তাদের প্রকৃত মনের মানুষ। গড়ে তোলে নিজস্ব সংসার, যেখানে সুখ-দুঃখের প্রবাহে বয়ে চলে জীবন নদী।

সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত সচেতন সুবোধ ঘোষ একসময় সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন আবার তিনিই সমাজে অবস্থিত নর-নারী সম্পর্কের গূঢ় তত্ত্বের অন্বেষণ করে ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু আমরা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করি অকৃপণ নির্সগ প্রীতি। উদ্ভিদ বা পশুপাখি যেভাবে নিসর্গের শোভা বর্ধক,

সুবোধ ঘোষের ব্যাখ্যায় সেই নিসর্গের রূপ অন্য মাত্রা লাভ করে। বাংলা সাহিত্যে কল্লোলের সমকালে দাঁড়িয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোল গোষ্ঠীর নিজস্ব জগৎ থেকে নিজেকে বাইরে এনে প্রকাশ করেন তাঁর ব্যক্তিত্বকে। প্রকৃতিই তাঁর রচনার মূল প্রেরণা। জাত রোমান্টিকের মত গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও তার প্রতি অনুরাগই বিভূতিভূষণের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। ভণ্ডুল মামা, ক্ষেন্তি, বুধী, পাঁচু এরা তাঁর সংস্কার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। একারণেই তিনি রচনা করতে পারেন 'পুঁইমাচা' বা 'মৌরী ফুল'। সেই সব গল্পে মানব জীবন প্রকৃতির অনুষঙ্গে বেড়ে চলেছে। এই সংস্কারকে গ্রহণ করে উত্তরাধিকার সূত্রে সুবোধ ঘোষ লেখেন 'ক্যাকটাস' বা 'হরেণ বাবুর হরিণী মেয়ে'। তাঁর 'অযান্ত্রিক' গল্পে যেভাবে যন্ত্রকে মানবায়িত করেন, ঠিক তেমনি ভাবেই তুচ্ছ একটি উদ্ভিদ ক্যাকটাসের মানবায়ন ঘটান। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মিস্টার নাগের প্রিয় বাগানটি ফুল-ফল লতাপাতার নানা বৈচিত্র্যের সমাহারে সজ্জিত। আরিজোনা মরুর দগ্ধ বালুকা থেকে এক ক্যাকটাস এনে তিনি স্থান দিয়েছেন নিজের বাগানে। বাগানের পরিচর্যা এবং নজরদারির ভার দেন দলবীরের হাতে। সারাদিন যদিও নিজেই বাগানের চর্যা করেন, কিন্তু রাতে দলবীরের ওপর সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। মাঘ মাসের শীতের হিম থেকে ক্যাকটাসকে বাঁচাতে একটি ফ্ল্যানেলের জ্যাকেট তৈরী করান মিঃ নাগ। গল্পে একটি বৈপরীত্য অঙ্কনের মধ্যে দিয়ে লেখকের প্রকৃতি প্রীতির সঙ্গে মানবপ্রীতিও পরিস্ফুট। দলবীরের বৃদ্ধা মা দার্জিলিং এর প্রচণ্ড ঠান্ডায় নিশ্চিন্তে ঘুমোতে না পেরে ছেলের কাছে কম্বলের আবদার করে। দলবীর তার সামান্য মাইনের টাকায় মায়ের অভাব পূরণ করতে পারে না। ছেলে হয়ে মায়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ দলবীর একদিন লক্ষ্য করে দিনের আলোয় শাক কুড়োনি বুড়ি রাত্রি হতেই বাগানে উঁকি দেয়। প্রচণ্ড গর্জনে বুড়িকে তাড়িয়েও দেয় কিন্তু একদিন অতি সর্ন্তপনে বুড়ি মিস্টার নাগের প্রিয় "স্বপ্নময় স্নেহে ও আদরে লালিত সেই ক্যাকটাসের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে..."(পৃ.৪৮৯) — ক্যাকটাসের গায়ে জড়ানো ফ্ল্যানেলের টুকরোটি বুড়িকে শীতের হাত থেকে রক্ষা করবে বুঝতে পেরে দলবীর একই সঙ্গে গর্বিত ও আনন্দিত। কারণ সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে যায় দার্জিলিং পাহাড়ে তার বৃদ্ধা মা কম্বলের অভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমোতেই পারেনা। মিঃ নাগের নজর কিন্তু এড়াতে পারেনা শাক-বুড়ি। শাক-বুড়ির এই চৌর্য বৃত্তি যে দলবীরের সাহায্যে সম্ভব হয়েছে এরকম সন্দেহ করেন মিঃ নাগ। সাধের ক্যাকটাসের জন্য মিঃ নাগ সম্পূর্ণ অন্ধ, অসহায় মানুষের জন্য সহানুভূতির কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে। জজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় তিনি বলেন — "আজ রাতের শীতে আমার ক্যাকটাস যে মরে যাবে রে চোর।"(পৃ. ৪৯০) দলবীরের ব্যক্তিসত্তা চরম অপমানিত বোধ করে এই চোর সম্বোধনে। বুড়ির জন্য যা করেছে তার জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয় সে, কিন্তু ক্যাকটাসগুলো অযত্নে মরে যাক তাও সে চায় না। তাই "চট করে একটা টান দিয়ে নিজের গায়ের তুলোর জামাটা খুলে ফেলে দলবীর।... আদরে আর যত্নে বিচলিত অদ্ভুত আগ্রহ নিয়ে তুলোর জামা দিয়ে কচি ক্যাকটাসের গা ঢাকা দেয় দলবীর।" (পৃ.৪৯০) এরপর বিজয়ীর মত চীৎকার করে ওঠে — "হাম আউর

নোকরি নেহি করেগা, হুজুর।"(পৃ.৪৯০) — শাক বুড়ির চুরি করে নিয়ে যাওয়া ফ্ল্যানেলটি ফিরিয়ে আনতে পারবে না সে; তা যেন হবে নিজের মায়ের শরীর থেকে শীতবস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া। আবার এতদিনের আদরের বাগানে বহুযত্নের ক্যাকটাসটিও তো মিঃ নাগের সন্তানসম। দলবীর সেটিকেও অবহেলা করতে পারে না। মানবিক সহানুভূতি ও হৃদয়বত্তার দুটি স্বতন্ত্র রূপ তুলে ধরা হয়েছে মিঃ নাগ এবং দলবীরের প্রতিতুলনায়। ক্যাকটাস প্রেমী মিঃ নাগের কাছে অন্য কোনো আর্ত, কাতর প্রাণের কোনো মূল্য নেই — সে মানুষ হলেও নয়, কিন্তু দলবীরের সহানুভূতি প্রসারিত শীতার্ত শাক বুড়ির দিকে যেমন, তেমন ক্যাকটাসটির প্রাণের জন্যও। এই গল্পের মধ্যে মানব সম্পর্ক যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার অনুষঙ্গে প্রকৃতি একটি গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

শুধুমাত্র উদ্ভিদ কিংবা বৃক্ষ নয়, মানবেতর প্রাণীরাও তো প্রকৃতিরই অংশ। আবার মানুষের সঙ্গে চলে তাদের একধরনের সংলাপ। 'হরেণ বাবুর হরিণী মেয়ে' গল্পটির নামকরণ থেকেই স্পষ্ট যে একটি হরিণী হরেণবাবুর কন্যা স্থানীয়। ছোট ছাড়োয়ার জঙ্গলে আদা ক্ষেতের সীমান্তে গোমস্তা হরেণবাবুর বাস। হরেণবাবুর স্ত্রী সকলের মনোকাকিমা যেদিন তার পুত্রের জন্ম দিয়েছে সেদিনই আরেক শিশু সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করে, যদিও সেটি মানবসন্তান নয়, একটি হরিণী। মাতৃহারা শিশু হরিণীটি মনোকাকিমার স্তন্যে লালিত হয়ে তারই মেয়ের আসন দখল করে। মেয়েরই মত পালিত হরিণীর ভবিষ্যতের জন্য ভাবনা হয়েছে তার। প্রাণীজগতের আদিমতম প্রবৃত্তি যখন হরিণীটির মধ্যেও জাগ্রত হয়েছে তখন তা মনোকাকিমার দৃষ্টি এড়ায়নি। একটি হরিণ রোজ রাতে হরিণীর খোঁজে তার বেড়ার ধারে এসে দাঁড়ায়। মনোকাকিমার কাছে সমস্ত বিষয় জেনে রামতনু ভেবেছিল হরিণীটাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হবে, কিন্তু এই প্রস্তাবে রাজি হতে পারে না মনোকাকিমা ও তার ছেলে। এ ব্যাপারে তাদের মত হল বুড়ি অর্থাৎ হরিণীরও বিবাহ দিতে হবে। একদিন হলও তাই। কপালে চন্দনের টিপ দিয়ে, উঠোনে আলপনা এঁকে বুড়িকে প্রায় সম্প্রদান করা হল পুরুষ হরিণটির কাছে। এতদিন সম্পূর্ণ উদাসীন হরেণবাবু এইবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। এইসময় সেনবাবু তাঁর নিজস্ব যন্ত্রণাময় অনুভূতিতে উপলব্ধি করেন — "আমি জানি মেয়ের বিদায়ের সময় বাপের বেশী কষ্ট হয়। মায়ের চেয়ে বাপই বেশী কাঁদে।" (পৃ.১৯৫) যে সেনবাবু উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন রতন সামন্তর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ের দিন ঐ হরিণের মাংস খাওয়াবেন, তাঁরই হৃদয়ে এই অসম বাৎসল্যের প্রকাশে সারা দিয়েছে, জেগে উঠেছে পিতৃত্বের হাহাকার। সেনবাবুর কন্যার বিয়ে ভেঙে গেছে, প্রতারণা করেছে রতন সামন্ত। হরেণবাবুর হরিণী মেয়ে নয়, সেনবাবুর মানুষী মেয়েকেই মাংসের মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকেরা মানবজাতির সঙ্গে পশুপাখি ও জন্তু জানোয়ারের প্রীতির বন্ধনকে গল্পের

বিষয় করেছেন নানাভাবে। চল্লিশের দশকের লেখক সুবোধ ঘোষ এই পথ অনুসরণেই হরিণশিশুটিকে মানব সন্তানের স্থানে দেখিয়ে ঐ প্রীতির বন্ধনকে আরো একবার স্পষ্টরূপে দেখিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকালেও জানা যায়, নাইট সার্ভিসের সময় একদিন তিনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন একটি ব্যাঘ্র শাবককে। তিনি শাবকটির নাম দিয়েছিলেন 'বিলি'। উত্তম ঘোষ পিতার জীবনের এই ঘটনাটিকে স্মরণ করতে গিয়ে বলেছেন — ''চরম দারিদ্র্যের করালগ্রাস থেকে লাল মোটর তাঁকে শুধু বাঁচায়নি, এই পেশা তাঁকে দিয়েছিল, এমন কিছু রসদ, এমন কিছু অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, এমন কিছু অনুভূতির পরশমণি, যা পরে তাঁর কলমের ডগা দিয়ে সোনা ফলিয়েছিল। ... অরন্যশ্বাপদ আর বহুবিচিত্র ধরনের যাত্রীকূল, এদের না দেখলে, কাছ থেকে দেখার সুযোগ না পেলে সুবোধ ঘোষের সাহিত্যে আলোর ঝর্ণাধারা এত অভিনবত্ব নিয়ে প্লাবিত হতে পারত না।'' [১৪] জঙ্গলের থেকে কুড়িয়ে আনলেও হাজারিবাগের বাড়িতে ভাত, ডাল, মাংস খেয়ে বড় হয়েছিল বিলি। বাঘিনীর সঙ্গে এই সখ্য এবং বাৎসল্যই তাঁকে হরিণীর মানবী রূপ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সুবোধ ঘোষের জবানিতে জানা যায়, ''লোকের কাছে আজ আমার পরিচয় এই যে, আমি একজন লেখক। কিন্তু লেখক হওয়ার জন্য আমার জীবনে কোন আকাঙ্ক্ষার তাগিদ কোনদিনও ছিল না। ... যখন আমার বয়স ত্রিশ একত্রিশ, তখন আমি প্রথম একটি গল্প লিখেছিলাম।... ঘটনাটা বস্তুত আকস্মিক, কোন অনুশীলিত প্রয়াসের পরিণাম নয়।'' — চল্লিশের দশকে পৃথিবী তখন উত্তাল। সারা ইউরোপ তখন আক্রান্ত। বিয়াল্লিশে শুরু হল 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, উনিশশো তেতাল্লিশ জুড়ে বাংলায় বিশাল দুর্ভিক্ষ। যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই ৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সব শেষে ৪৭ এ ভারত বিভাজন। এই ভয়ংকর দুর্দিনে সুবোধ ঘোষের গল্প লেখার সূত্রপাত। 'অযান্ত্রিক' তাঁর প্রথম গল্প। অনামী সংঘের সদস্য সুবোধ ঘোষ বন্ধুদের তাগিদে বাধ্য হয়েছিলেন গল্প লিখতে। এই সূত্র ধরেই তিনি পরবর্তী প্রায় ত্রিশ বছর ধরে গল্প রচনা করেছেন। ভাবনা-কল্পনা ও অনুভবের মধ্যে জীবনবৈচিত্র্যের যে ছবি রূপান্বিত হয়েছিল, তারই প্রতিছবি বিভিন্ন গল্পরূপে বিমূর্ত হয়েছে। নানা অভিজ্ঞতায় ও জীবনদর্শনে লেখকের কলমে একের পর এক গল্প রূপ পেয়েছে যারা নিজেরাই নিজেদের তুলনা।

প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন চেহারার স্পষ্ট রূপ প্রকাশিত হয়েছে, যদিও তার বর্ণনা সূক্ষ্ম এবং সরল। গল্পের নায়ক বিমলকে লেখক দেখেছিলেন লাল মোটর কোম্পানীতে, একই সঙ্গে জগদ্দলকেও। বাংলা সাহিত্যে যন্ত্রের মানবীকরণ এই প্রথম। গল্পের সূচনায় বিমলের যে এক গুঁয়েমি দিয়ে শুরু হয়েছে তাকেই যেন গল্পের শেষে ভাঙ্গা হয়েছে। গল্পকার যেন ভাঙ্গা গড়ার নেশায় মেতেছিলেন। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে সারি সারি নতুন মডেলের ট্যাক্সির পাশে জরাজীর্ণ আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিমলের ফোর্ড গাড়িটি। বিমল আদর করে এর নাম দেয় জগদ্দল। লেখকের বর্ণনায় জগদ্দলের

স্বরূপটি ফুটে ওঠে — "তালিমারা হুড, সামনের আর্শিটা ভাঙ্গা, তোবড়ানো বনেট, কালি ঝুলি মাখা পরদা আর চারটে চাকার টায়ার পটি লাগানো; সে এক অপূর্বশ্রী" (পৃ.১৬, শ্রেঃ গ) শেষ বাক্যটি নিতান্ত ব্যঞ্জনাময়। এর মধ্যে দিয়েই তীব্র এক আঘাত হানেন লেখক। তবু ও জগদ্দলকে প্রাণ দিয়ে আগলে রাখে বিমল। জগদ্দল সম্পর্কে কোন বাজে মন্তব্য শুনতে পেলেই বিমল সজোরে প্রতিবাদ ঘোষণা করে — "মশাই বুঝি কোন নোংরা কম্ম করেন না, চেঁচান না, দৌড়ান না? যত দোষ করেছে বুঝি আমার গাড়িটা?" (পৃ. ১৬) হাজারো বিদ্রূপ আর বিশেষণকে বহন করে জগদ্দল চলেছে। শ্রমজীবী বিমলের জীবনধারণের একমাত্র বাহক জগদ্দল, আবার তার সঙ্গিনীও বটে। বিমলের আহ্বানে যখন জগদ্দলের আর সাড়া দেবার ক্ষমতা থাকে না, তখন জগদ্দলের তৃষ্ণার্ত মুখে জল ঢেলে তাকে শান্তকরে বিমল। লক্ষনীয় যে, বিমল যেমন জগদ্দলের সুখ সুবিধাকে উপলব্ধি করে, যন্ত্র হয়ে জগদ্দলও তার সঙ্গীর অভাব পূরণ করে। বিমলের নিজের প্রসঙ্গেও ঘুরে ফিরে এসে পড়ে যন্ত্রের কথা। তাই তো সঙ্গী গোবিন্দর কাছে জগদ্দলের ওপর প্রবল চাপের কথা জানায় — "এর শোধ তুলব সন্ধ্যায়। ডবল ওভারলোড নেব, যা থাকে কপালে।" (পৃ.১৭) আবার জগদ্দলের সুস্থতা কামনা করে ভগবানের কাছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে যন্ত্রের মালিকানা এবং ব্যবহার মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে বিভেদ ঘটিয়ে দেয় এই গল্প যেন তার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ। যন্ত্র সভ্যতা মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করে। কিন্তু সুবোধ ঘোষ যন্ত্রের মানবীকরণ ঘটান। বিমল এবং জগদ্দল হয়ে ওঠে পরস্পরের পরিপূরক। যন্ত্রও একদিন বিকল হয় - সময়ের নিয়মেই জগদ্দলের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন 'পার্টস' এর ক্ষয় হলে একদিন সত্যি সত্যিই জগদ্দল বিকল হয়ে পড়ে। মোটর বিশারদ পাকা মিস্ত্রী বিমল আবার নতুন করে তাকে সাজিয়ে তোলে। যেন অসুস্থ আপনজনকে চিকিৎসার পর নতুন জীবন দান করে ফিরিয়ে আনে। কারণ জগদ্দল কেবল বিমলের জীবিকার নয়, জীবনেরও সঙ্গী। দীর্ঘদিনের সঙ্গী জগদ্দল তাকে হতাশ করবে না বলেই বিশ্বাস বিমলের। তাই বিমল নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে জগদ্দলকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জগদ্দল আর সক্ষম হয়ে উঠতে পারে না। বার্ধক্য এসে গ্রাস করে তাকে। কিন্তু বিমল তা মানতে চায়নি। মুহূর্তের মধ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে সে — "আদর বোঝে না, কথা বোঝে না, শালা লোহার বাচ্চা, নির্জীব ভূত।"(পৃ.২২) বিমলের মনে হতে থাকে সে যেন প্রতারিত হয়েছে। যে মমত্ব দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, তার এতকালের ভালোবাসা দিয়ে জগদ্দলকে আঁকড়ে ধরেছিল বিমল, তার কোন মূল্য সে পেল না। অবশ্য এই জগদ্দলই এতকাল ধরে তার বাঁচার রসদ যুগিয়েছে। কিন্তু পরিণত বয়সে চুলে যখন পাক ধরেছে তখন পরিশ্রান্ত বিমল একসময় উপলব্ধি করেছে জগদ্দলেরও অবসরের সময় হয়েছে মানুষের যেমন হয়। বিমল জগদ্দলকে বিদায় দেয় প্রিয় বন্ধুকে বিদায় জানাবার মতো — "যা জগদ্দল ভাল মনেই বিদায় দিলাম। অনেক খাইয়েছিস, পরিয়েছিস, আর কত পারবি? আমার যা হবার হবে।" (পৃ.২২) বিমলের দুচোখে দুফোঁটা জলের ধারা প্রমাণ করে জগদ্দল বিমলের কত আপন। একান্ত

আপন জনের মতই এতকাল তাকে আগলে রেখেছিল। যুদ্ধের বাজারে বিমলের দুরবস্থা দেখে গোবিন্দ নিয়ে এসেছে মারোয়ারি ভদ্রলোককে; তখন বিমলের সামনে ভবিষ্যতের ছায়ামূর্তির মত স্পষ্ট হয়েছে ক্ষুধামূর্তিটি। পুরনো লোহার সঙ্গে মারোয়ারি কিনতে চায় জগদ্দলকেও — "লড়াই লেগেছে, এই তো মৌকা, ঝেড়ে পুছে সব দিয়ে ফেলুন বাবুজী।" (পৃ. ২৩) ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বিমল বলে — "হাঁ সব দেব। আমার ঐ গাড়ীটাও।" (পৃ. ২৩) বাজার অর্থনীতির হাতে এমন ভাবেই বিকিয়ে যায় সম্পর্ক, অনুভূতি। নেশার ঘোরে বিমল শুনতে পায় — "ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং — জগদ্দলের সমাধি খনন চলেছে।" (পৃ. ২৩) — ১৫ বছরের সঙ্গিনীকে ধনিক শ্রেণীর কাছে তুলে দেওয়াই একরকম প্রিয়ার সমাধি। লোহা লক্কড় কিনতে আসা মারোয়াড়ির কাছে জগদ্দলকে বিকিয়ে দিয়ে বিমল আজ একাকী, নিঃস্ব। যন্ত্রের যান্ত্রিকতাকে অতিক্রম করে বিমল যে জগদ্দলকে নিজের আত্মীয়সম করে তুলেছিল। এই পরিণতি বুঝিয়ে দেয় বাজার অর্থনীতির বিশ্বজোড়া জালের মধ্যে মানুষ এবং তার অনুভূতিগুলি কত অসহায়।

'ভাট তিলক রায়' গল্পে তিলক রায় একজন ভাট। 'ভাট' কথা'টির আক্ষরিক অর্থ স্তুতি পাঠক। প্রাচীনকালে এই শব্দটি প্রচলিত ছিল। রাজদরবারে কোন এক রাজার স্তুতি গান করত এইসব ভাটেরা। তিলক রায় এমনই এক ভাট যে যুগ যুগান্তরের সমস্ত ক্ষোভ তার গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে, অতীতের ব্যথা বিদীর্ণ কোন কাহিনিকে, সেই ইতিহাস এবং কিংবদন্তীকে জনগণের কাছে গান গেয়ে শোনায়; তার গানে কোন রাজার স্তুতি নেই। অতীতের গানই গেয়ে শোনায় তিলক রায়। গল্পকথক স্বয়ং শ্রোতা হয়ে শুনেছেন তিলকের গান। সেই গানে তিনি দিশেহারা হয়ে ইন্দ্রজালের জঙ্গলে অর্থাৎ অতীতের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন। তিলকের গানই অনেক অনেক যুগ আগের ইতিহাসের দৃশ্যে সহজে নিয়ে যেত, সেই আদিম সভ্যতার মানুষগুলির সঙ্গে শ্রোতা স্বয়ং একাকার হয়ে যেতেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় শেষ দুর্গ যেমন আগলে রেখেছিল বৃদ্ধ সিপাহী আমৃত্যু, তেমন ভাবে অতীতের ভাট তিলক আগলে রাখতে চেয়েছে অতীতকে, ভবিষ্যতের গানকে সে সইতে পারেনি। যন্ত্রসভ্যতার জয়ধ্বজা যখন উচ্চ শিখরে উঠে লাল্‌কি নদীর বাঁধ তৈরী করছে সেই ঘটনাকে সহজে মেনে নিতে পারেনি তিলক রায়। বহুরূপীর পেশা ছেড়ে দিয়ে, অতীতের ইতিহাসের কাহিনি বর্ণনার পরিবর্তে সাবধান বাণী শুনিয়ে বেড়াতে থাকে তিলক, "ভয়ঙ্কর একটা অমঙ্গল আসছে, সময় থাকতে একটা বিহিত ব্যবস্থা করা চাই।" (পৃ.১১১) প্রথম থেকেই তিলকের আশঙ্কা ছিল লাল্‌কি নদীর বাঁধ আসলে নররক্তপান করতে উৎসাহী। এক একটি 'থাম' পাঁচটি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়ে তবে নির্মিত হয়েছে। 'লাল্‌কি নদীর বাঁধ' প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষ একে 'বিশ্বকর্মার কিরীট' রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। ভাট তিলকের মনে হয়েছে তাদের নিমিয়াঘাটে যন্ত্রসভ্যতার অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে। পরবর্তীকালে তিলকের নেতৃত্বে শ'চারেক কুর্মি কুলি বাঁধের কাজে নিযুক্ত হয়েছে। তারই নেতৃত্বে কুলিরা ধর্মঘটে অংশ নেয়না, কারণ তারা এতদিন যে দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে তার সবটা অভাবই পূরণ হয়ে গেছে। সমস্ত

অভাব অনটন থেকে মুক্তি পেয়ে আজ তারা আনন্দিত। অন্যদিকে ধর্মঘটী কুলিরা তিলক রায়ের ওপর আক্রমণ চালায়। পরে ধর্মঘটীদের সঙ্গে মালিকপক্ষের চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তিলক রায়ের কুলিরাই ছাঁটাই হয়, এরই প্রতিশোধ নিতে তিলক রায় একটি পিলার বারুদের সংযোগে ব্লো করে দিয়েছে, তারই নীচে চাপা পড়ে অতীতের কাহিনি কথক ভাট নিজেই ভবিষ্যতের কাছে Myth হয়ে গেল। একা যন্ত্রযুগের বিরুদ্ধে লড়ে প্রাণ দিয়েছে ভাট তিলক রায়। তার সমস্ত সংশয়কে আজ সে চরম সত্য বলে জেনে লড়াই করতে করতে ফুরিয়ে গেল। যেন আগামী সময়ের কানে রেখে গেল তার লড়াইয়ের গান। গল্পের নামকরণের ব্যঞ্জনা এখানেই। যন্ত্র সভ্যতার প্রতি তার ধারণা, যন্ত্র মানুষের রক্তপান না করে ক্ষান্ত হবে না, নিজের রক্তের বিনিময়ে তিলক রায় এই সত্য প্রমাণ করেছে।

সুবোধ ঘোষ প্রায় বারংবার গল্পের নামকরণ করেন গল্পের বিষয়কে ভাঙবেন বলেই। 'অলীক' গল্পটিতেও সেই ব্যঞ্জনা প্রকাশিত। 'অলীক' শব্দের আক্ষরিক অর্থ অসত্য বা অমূলক। গল্পের প্রধান চরিত্র অলীক, তার পিতৃদত্ত নামটি আজ মুছে গেছে। পুলিশের খাতায় বহু নামে পরিচিত এই অলীক, শুধুমাত্র স্ত্রী নাকছাবির মনের কোন এক গভীর কোণে রয়ে গেছে তার পিতৃদত্ত নামটি। নাকছাবিকে প্রবোধ দিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় ধোপ দুরস্ত পোশাকে বাইরে যায়, ক্লাবে গিয়ে বা মিটিংয়ে গিয়ে তার রাত হয়ে যায় একথা বিশ্বাস করতে বাধ্য নাকছবি। অগ্রহায়ণ মাসের প্রায় প্রতিটি দিনই তার মিটিং থাকে, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আসলে ধোপদুরস্ত পোশাক পরিধান করে সন্ধ্যা থেকেই অলীক খুঁজে বেড়ায় জাঁকজমক পূর্ণ বিয়ে বাড়ি। উৎসব মুখর সেইসব বাড়িতে কলাকৌশল করে প্রতি দিনই তার আহার সমাধা হয়। অথচ বাড়িতে স্ত্রী নাকছাবি ঘরের মেঝেয় শুয়ে উপোসী আত্মাকে শাসন করতে করতে অবশ শরীরে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। গভীর রাতেফিরে তার গিলেকরা ধুতির পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে অলীক। সারা রাতই সে তার পরের দিনের মিটিং এর জন্য পোশাক টিকে ধোলাই করে। নাকছাবি ও সকলের সঙ্গে প্রতারণা করতে করতে অলীক একসময় নিজেকেই প্রতারণা করে। বিয়ে বাড়ির ভোজে অংশ নিয়ে উভয় পক্ষের আতিথেয়তা পাবার নেশা জন্মেছে তার মধ্যে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ বিয়ের তারিখে সবচেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ বিয়ে বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে শহরের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ায় অলীক। নিয়তির অমোঘটানে অলীক টুনি নামক মেয়েটির বাড়িতে এসে দাঁড়ায়। পাত্রপক্ষের দাবীমত নগদ অর্থ দিতে না পারায় টুনির বিয়ে ভেঙে যেতে বসেছে শুনে অলীক আরো এক মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এগিয়ে যায়। পাত্রের কাকা সেজে টুনির বাবার কাছে পরিচিত হয়ে টুনির বিবাহ সম্পন্ন করে। পরদিন পাত্রপক্ষের হাতে নগদ অর্থ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অলীক টুনির বিবাহ দিতে সক্ষম হয়। সেদিনও এক মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হল অলীক। একের পর এক মিথ্যার আশ্রয় নিতে গিয়ে তার আত্মা যখন হয়ে উঠেছিল অলীক, তখন গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেন গল্পকার। নিঃসন্তান অলীকের পিতৃহৃদয় হাহাকার করে ওঠে টুনির জন্য, একটি কন্যা সন্তানের

জন্য। তাই নাকছাবি যখন স্বামীর মঙ্গলার্থে ভৈরবীতলায় পুজো দিতে যায় - অলীকের পিতৃসত্তা প্রার্থনা করে একটি কন্যাসন্তান। এতদিন ঘুরে ঘুরে বিয়ে বাড়ির ভোজে অংশ নিয়েছে অলীক, কিন্তু কখনই সেসব কন্যাদের মঙ্গলকামনা করতে পারেনি তার মন। এবারে যেন সে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করল কন্যার পিতার মর্মবেদনা। সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে বলেই অলীক কন্যা সন্তান প্রার্থনা করে, এ প্রার্থনা একান্তই অলীকের অন্তরের প্রার্থনা, কোন অমূলক প্রার্থনা নয়। নাকছাবিকে বলে 'মানত করিস যাতে মেয়ে হয়।' এতদিন অলীক কেবল নিজের সুখের কথা ভেবেছে। টুনির অশ্রুপ্লাবিত মুখে হাসি ফুটতে দেখার পর সে অনুভব করে অন্য মানুষকে বিশেযত আত্মজকে আনন্দ দিতে পারা যে আরও কত বড় সুখের। যে মিথ্যাচার মানুষটিকেই অলীক করে তুলেছিল সেই খোলস থেকে বেরিয়ে আসে সে, বিকিয়ে যাওয়া আত্মা পুনরায় ফিরে পায়, কিন্তু তখনই ভেঙে পড়ে। মেয়ে বিদায়ের ক্ষণটিতে কান্নাকে চুরি করার লোভ হয় অলীকের। জীবনকে মিথ্যা মোড়কে সাজিয়ে, অলীক সেজে সে তার পিতৃসত্তাটিকে চাপা দিতে চাইলেও টুনিকে কেন্দ্র করে অলীকের সমস্ত অলীকতা ঘুচে যায়। নাকছাবির কাছে পিতৃহৃদয়ের সকল দুর্বলতা প্রকাশ করে অলীক।

পিতৃস্নেহের পাশাপাশি মাতৃস্নেহকে গল্পকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন 'মিছার মা' গল্পে। নারীর তিনটি রূপ জননী, জায়া এবং কন্যা-এর মধ্যে জায়া বা প্রেমিকা বা গৃহিনীর রূপ অঙ্কন করেছেন বেশ কিছু গল্পে। জননীর বাৎসল্যকে কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেছেন 'পরশুরামের কুঠার' গল্পটি। যেখানে দুধমা ধনিয়া একসময় বহু সন্তানের জন্ম দিয়েছে, অথচ সন্তানের কচি হাতের স্পর্শ সুখ লাভে বঞ্চিত থেকেছে। মা হবার দুঃখ পেলেও তার আনন্দ লাভে অপ্রাপ্তি থেকেছে। মাতৃত্বকে ধনিয়া নিজের পেশায় পরিণত করেছে, কিন্তু মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য তার বাঁধ মানে নি। তাই দেখা যায় অনাথ আশ্রমের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে, যেখানে তার প্রায় ছটি সন্তান বড় হয়ে উঠেছে, ধনিয়ার বাৎসল্য যেন অবারিত ধারায় নির্গত হয়েছে। গল্পটির মূল বক্তব্য ভিন্ন হলেও ধনিয়ার মাতৃত্ব ও তার স্নেহ প্রকৃত। 'মিছার মা' গল্পে মা এর সনাতনী রূপ বিশেষভাবে প্রকটিত। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুক্তো, সন্তানের জন্ম সে কখনই দিতে পারেনি — স্বামী পুলিশের ভয়ে পালিয়ে গেলে মুক্তোও পেটের দায়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে কাজ নিয়ে নিজের পেট চালিয়েছে এবং তিন হাত জায়গা নিয়ে আর সকলের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছে। তার সঙ্গীরা প্রত্যেকেই সন্তানের পরিচয়ে পরিচিত নুটুর মা, দাসুর মা। মুক্তোর সেই পরিচয়টুকু নেই বলেই সঙ্গিনীরা তাকে 'মিছার মা' নামে পরিচিত করেছে। মিছার মা নামের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে মুক্তোর প্রকৃত পরিচয়টি, যেমন করে অলীক তার মিথ্যে পরিচয়ে বেঁচে আছে। চার বছর ধরে ঐ মিথ্যাকে বহন করে করে ক্লান্ত মুক্তো মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণে উদগ্রীব হয়ে উঠল। অনেকদিন থেকেই মুক্তোর প্রতি নন্দ আকৃষ্ট হলেও নন্দর ডাকে সাড়া দেয়নি মুক্তো। কিন্তু মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষায় নন্দর ডাকে সাড়া দিয়েছে। পরের ছেলে কোলে করে নয়, নিজের একান্ত নিজস্ব একটি সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরার বাসনা নিয়ে নন্দর সঙ্গে ঘর

বাঁধার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নপূরণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার পুরনো মনিব সন্তান। যেদিন নন্দর সঙ্গে তার চলে যাবার দিন এল, পুরনো হিসেব মেটাতে মনিবের দরজায় এসে দাঁড়ায় মুক্তো। মনিব সন্তান অসুস্থ টুলুকে দেখে মুক্তো স্নেহবন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। টুলুও মুক্তোর আঁচলের প্রান্ত তার মুঠোয় বন্দী করে মুক্তোর সমস্ত হিসেব এলোমেলো করে দেয়। নিজের সন্তানের কাছে মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হল না, কিন্তু পরের সন্তানকে বুকে জড়িয়েও তার মনে যে মাতৃত্বের জাগরণ হল সেটা তো মিথ্যে নয়। শেষ পর্যন্ত নন্দর ডাকে সাড়া দিয়ে মাতৃত্ব বরণ মুক্তোর সম্ভব হলনা। মিথ্যে মা এর স্নেহ জড়িয়েই সে সুখী হতে চাইল। ধনিয়ার নিজ সন্তান থাকা সত্ত্বেও দূর থেকে তাদের প্রতি বাৎসল্য ঝরে পড়ে, অন্যদিকে পরের সন্তানের প্রতি বাৎসল্যেই মুক্তো ভুলে যায় নিজের ঘর বাধার স্বপ্নটুকু। ধনিয়া এবং মুক্তো - মাতৃত্বের দুই রূপ অঙ্কন করলেও মাতৃত্ব কোনখানেই মিথ্যে বা অলীক নয়।

আবহমান কাল ধরে মানুষ যে সম্পর্কগুলোকে নিজের মনে লালন করে বেঁচে আছে তাকে তারা নষ্ট হতে দেয় না। এরকমই এক সম্পর্ক মা ও সন্তানের সম্পর্ক। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল গ্রাসে পড়ে দিন দিন সেই মানবতার চরম ক্ষতি শুরু হয়েছে। মাতৃত্বের অবমাননা ঘটেছে বারংবার। ‘কতটুকু ক্ষতি’ গল্পে আর্টিস্ট ও ফোটোগ্রাফারের মধ্যে কে বড় শিল্পী এবং শিল্পের প্রকৃত মর্ম বা মূল্যকে খুঁজেছেন সুবোধ ঘোষ। ‘স্বাক্ষর’ পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়বাবুর সঙ্গে আর্টিস্ট ও ফোটোগ্রাফার দুজনেই আলাদাভাবে দেখা করে, দুজনের প্রকৃত শিল্পী সত্তা ধরা পড়ে দেশকল্যাণ সমিতি আয়োজিত এক প্রতিযোগিতায়। প্রতিযোগিতার বিষয় “অনশন ও বুভুক্ষার ফলে মানবতার চরম ক্ষতি কি হতে পারে।”(পৃ.৩৩০) — দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে শিল্পী তার রং তুলি দিয়ে, কল্পনার চরম শিখরে পৌঁছে যে ছবি অঙ্কন করেছে সেটি ব্যর্থ মাতৃত্বের একটি সুকরুণ দৃশ্য। ক্ষুধাজীর্ণ ভিখারিনি তার মুমূর্ষু শিশুর মুখে দুধ তো দিতে পারছেই না বরং মাতার চোখ থেকে তপ্ত মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা ঝরে পড়েছে শিশুটির অধরে। করুণ দৃশ্য সন্দেহ নেই। আবহমান কালের মাতৃত্বের চরম রূপ এটি। হঠাৎই পত্রিকার শেষ পাতায় ফোটোগ্রাফারের তোলা ছবি সকলকে আঘাত করে। যুগ যুগান্তের প্রত্যয়ে লালিত একটি মোহ বাস্তবের রূঢ় আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এ কোন কল্পনা নয়, রূপকথা নয়, কিংবদন্তীও নয়। কলকাতার পথের ওপর কুড়িয়ে পাওয়া অতি বাস্তব এক সত্য ছবি, যা সম্পূর্ণ নিরলঙ্কার। ছবিটি সকলকে স্তম্ভিত করে দেয়। এক শিশু সেবা প্রতিষ্ঠানের দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রের সামনে গাছের তলায় এক ভিখারি মাতা, তার কোলের ওপর মুমূর্ষু শিশু সন্তান। অথচ শিশুটির নিঃশেষিত প্রাণবায়ুর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই ভিখারিনি মা তার শিশুরই বরাদ্দ এক মগ দুধ ঢগঢগ করে পান করছে। আজীবন লালিত এক বিশ্বাস মা ও সন্তানের সম্পর্কের অবমাননা ঘটেছে এখানে। ব্যর্থ মাতৃত্ব নয়, হৃত মাতৃত্বের সার্থক ছবি এটি। যে মাতৃত্ব কেবল মানবিক নয়, জৈব ও তার কী মর্মান্তিক পরিণতি। শিল্পী ও ফোটোগ্রাফারের দ্বন্দ্ব আসলে মানুষের বিশ্বাস ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব। মানুষের মনে

লালিত বিশ্বাসকে সে কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে চায় না, অথচ নির্মম বাস্তবের সত্য তাকে পিছনে ফেলে নিজে জয়ী হয়। সুবোধ ঘোষের লেখায় সেই সত্যই প্রতিফলিত।

বাস্তবতাকে সুবোধ ঘোষ তাঁর রচনায় উন্মোচন করেন নিপুণ শিল্পীর মতই। 'চতুর্ভুজ ক্লাব' গল্পে বাস্তব জীবন সত্যেরই রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পে কথক ভবানী তাদের ছেলেবেলার একটি গল্প শুনিয়েছে। এই গল্পটি আপাত অর্থে তাদের 'চেংড়া বয়সের' নিছক একটা গল্প মনে হলেও সেটি আসলে মানুষজাতির অল্প বয়সের গল্প। 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' এর কাহিনি থেকে জানা যায় শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের ফল খেয়ে অভিশপ্ত প্রথম মানব-মানবী স্বর্গভ্রষ্ট হয় এবং জৈব ধর্মের শিকার হয়। এই শয়তান আসলে জৈবধর্ম যা যৌবন থেকে আসে। যৌবনের কামনা বাসনা যখনই মানুষকে তাড়না করতে শুরু করে তখন তার কৈশোর-কাল বিলুপ্ত হয়। বিনু, দীপু, নরু, আর ভবানীর কৈশোর কালে রচিত স্বর্গজগৎই 'চতুর্ভুজ ক্লাব'। চার সদস্যই প্রত্যেকে প্রত্যেকের মধ্যে ঐক্য রাখতে তৎপর। যেকোন মূল্যেই তারা তাদের চতুর্ভুজ ক্লাবকে নষ্ট হতে দেবে না। চারসদস্যের একজন বিনু হঠাৎই একদিন বিবাহ করে বৌ নিয়ে আসে। ক্লাবের অন্য তিন সদস্য বিনুর বউ দেখতে উপস্থিত হয়েছে তার বাড়ীতে। বিনু সেদিন তার টুকু বৌকে সকলের সামনে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল — "এইলে, চতুর্ভুজ ক্লাবের একটা নতুন জিনিস হলো এবার।"(পৃ.২৮২) — গ্রামোফোন, ক্যামেরা এবং সাইকেলের মত টুকু বৌও তাদের ক্লাবের নতুন সম্পদ, যেখানে তাদের সকলের সমান অধিকার। মহা সমারোহে তাদের প্রথম দিনের পরিচয় এবং উৎসব পালিত হল। এরপর প্রায় প্রতিদিনই বিনুর বাড়িতে বাকি তিন জনের উপস্থিতি এবং টুকু বৌ এর সঙ্গে হাসি-গল্প-খাওয়া-বেড়ানো চলতে লাগল। চতুর্ভুজ ক্লাবের অনাবিল আনন্দের মাঝে আচমকাই এক কালো মেঘের ছায়া দেখা গেল। বিনু এখন আর তাদের চারজনের আনন্দে যোগ দিতে পারেনা। কারণ তার অধিকারবোধ জেগেছে, তার মধ্যে ধীরে ধীরে জৈব ধর্মের সূচনা হতে শুরু করেছে যা পরে সঞ্চারিত হয়েছে অন্য তিন সদস্যদের মধ্যেও। টুকু বৌ বিনুর আচরণে ভীত হয়েছে। তবুও বিনু আলাদা থেকেই দূর থেকে ওদের আনন্দ দেখে। কিছুদিন এমনি করেই চলছিল চতুর্ভুজ ক্লাব। পুজোর ছুটির প্রথম দিনই সেই কালো মেঘের অস্পষ্টতা স্পষ্ট রূপ ধারণ করে। টুকু বৌ এর হাতে নারকেল খিচুড়ি খাবার নিমন্ত্রণ তাদের সকলের। দীপু-নরু-ভবানী প্রত্যেকেই উঠোনের খড়ের গাদায় শুয়ে রয়েছে। বিনু কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের অধিবাসী, সে বাড়ির সবচেয়ে ভেতরের ঘরে শুয়ে বই পড়ছে। অন্য তিনজনে অপার আনন্দে টুকু বৌ এর খিচুড়ির অপেক্ষায় বসে আছে। টুকু বৌ খুব ব্যস্ত হাতে রান্না সেরে নিচ্ছে। এমন সময় তারা তিন বন্ধুই আলাদা করে দেখল টুকু বৌ-কে, রান্না ঘরে একা বসে থাকা টুকু বৌ এর রূপ তাদের মুগ্ধ করে। তিনজনেই কামনা করে টুকু বৌ কে। আর সেই মুহূর্তে তাদের বাল্যের অনাবিল আনন্দের জগৎ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। টুকু বৌ তাদের পাত পেড়ে খেতে দিল ঠিকই, কিন্তু ভদ্রঘরের তিন পরিচিত ব্যক্তিকেই যেন আপ্যায়ণ

করেছে টুকু বৌ। পাশে দাঁড়িয়ে বিনু তাদের খাবার তদারকি করেছে। আসলে এখন তারা প্রত্যেকেই কৈশোর থেকে চ্যুত হয়ে — যৌবনে এসে পৌঁছেছে। তাই খাওয়া শেষ করে তিন সদস্য যখন নির্বাক মুখে দাঁড়িয়েছে তখন বিনুই তাদের চলার গতি যুগিয়েছে। টুকু বৌ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাদের নিজস্ব জিনিসগুলি নিয়ে যেতে। কারণ পৃথিবীতে চতুর্ভুজ ক্লাব থেকে যেতে পারে না। যৌবন এলে কৈশোর স্বর্গ লুপ্ত হবে এটাই সত্য এবং স্বাভাবিক। গল্পের শেষে চতুর্ভুজ ক্লাবের অন্য সদস্যরা চলে যেতে বাধ্য হয়। অবশিষ্ট থাকে বিনু ও টুকু বৌ। পাশের বাড়ির মেয়েরা বাঁদর ও বাঁদরি নামে অভিহিত করে বিনু ও টুকু বৌ কে। কারণ তারা শেষ পর্যন্ত যৌব ধর্মের অঙ্গনে পৌঁছে গেছে। গল্পের নামকরণে 'চতুর্ভুজ' শব্দটির অর্থ বাঁদর। বাঁদর জাতির একটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক হল — অনেকগুলো বাঁদর একটি বাঁদরিকে নিয়ে খেলা করলেও মূলত বাঁদরির সঙ্গে যৌন মিলনে নির্দিষ্ট বাঁদরেরই অধিকার। বিনু ও টুকু বৌ যেন ঐ নির্দিষ্ট বাঁদর বাঁদরিতেই পরিণত হয়েছে।

সুবোধ ঘোষ যেসময়ে বাংলা কথা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন, সেসময়টি যে ভারতবর্ষের মহাসঙ্কটের কাল সে বিষয়ে পূর্বেই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির কোন বিষয়ই বাংলা সাহিত্যের বহির্ভূত নয়। সুবোধ ঘোষও সমকালীন সংকটকে উপলব্ধি করেছেন সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা। এই জীবনদর্শনই তাঁকে সাহায্য করে 'তমসাবৃতা' গল্পটি রচনা করতে। এরই অন্য রূপ ফুটে উঠেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পে। মহাভারতে সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। মহাভারতের এই Myth টি ব্যবহার করে গল্পকারেরা কৃত্রিম বস্ত্র সংকটের চরম রূপটি উপস্থাপন করেছেন। দুঃশাসনের কবলে পড়ে লজ্জা নিবারণের জন্য দ্রৌপদী শরণ নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে রাবেয়া লজ্জার হাত থেকে নিস্কৃতি পেতে আশ্রয় নিয়েছিল অন্ধকার পুকুরের জলে। কল্লোল সমকালের লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নেতিবাচক জীবনদর্শনে রাবেয়ার মৃত্যুতে গল্পের পরিণতি দেখান, কিন্তু সুবোধ ঘোষ ধুলগড়া গ্রামের বাউড়ী চাষী ও তাঁতী বউদের সমবেত জীবন উদ্যমকে দেখিয়েছেন। বস্ত্র সংকটের মাঝে পড়েও গ্রামের নারী সমাজ নিজেদের বিকিয়ে দেয়নি অন্যের হাতে। এমনকি আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়নি। জীবনের সমস্ত অন্ধকারের মাঝেও তারা বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। শুধু বেঁচে থাকা নয়, সগর্বে-সানন্দে তারা জীবনের সমস্ত হতাশাকে জয় করে নেবার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বাউড়ী চাষী আর বোষ্টম তাঁতীদের গ্রাম ধুলগড়া, তারা যতটা সম্ভব নিজেদের আভিজাত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। প্রাণপণ খেটে তারা ক্ষেত ভরে ফসল ফলিয়েছে, গঞ্জের হাটে দ্বিগুণ দরে সে ফসল বিক্রি করে এসেছে, কিন্তু কিছুদিন পরই সে সমস্ত টাকা ধুলগড়ের মাটির চাইতেও মূল্যহীন হয়ে গেছে। কারণ মাস তিনেক অভাবের আতঙ্ক তাদের গ্রাস করে নেয়। ১৯৪৪ সালে সারা বাংলা ব্যাপী এক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে, মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃত্রিমভাবে সঙ্কট সৃষ্টি করার ফলে

সাধারণ জনগণ বা গরীব চাষীদের পক্ষে অন্ন আর বস্ত্র দুই-ই চলে গেছে নাগালের বাইরে। ধুলগড়ের অসহায় চাষী বাউড়ীদের পুরুষেরা 'প্রায় উলঙ্গ' হয়েই মাঠে মাঠে কাজ করে বেড়ায়। তাদের হাতে হাতে কাজ এগিয়ে দিতে সঙ্গ দেয় বাড়ির মেয়েরাও। একমাত্র জবা তার মান মর্যাদার দোহাই দিয়ে মাঠে যায়না, কুঞ্জর মেয়ে জবা আসলে বাউড়ীদের সবচেয়ে সুন্দর ছেলে দয়ারামের বিধবা স্ত্রী। দয়ারামের ভালোবাসা আর সম্মানকে আজও আঁকড়ে ধরে আছে জবা। তাই তার বাবা কুঞ্জর কথাতেও জবা রাজি হয় না। কুঞ্জর ভাষায় "তোর ওসব চিন্তে কেন? তুই কাজ করবি মাটির সাথে। মাটির দিকে তাকিয়ে থাকবি।" উত্তর দেয় জবা — "না, আমি পারবো নাই।"(পৃ.১৬৬) — শরতের রোদ্রে পঞ্চমীর পরব যখন ঘনিয়ে আসে, তখনও উৎসবের রূপ চোখে পড়ে না, শুধু শোনা যায় — "বিবস্ত্র ক্ষুধাজীর্ণ ধূলগড়ার শূন্য পাকস্থলী ও ফুসফুস যেন গর্জন করছে।"(পৃ.১৬৭) একসময় এইসব মানুষের প্রতি কুঞ্জেরও ঘৃণা জাগ্রত হয়, কিন্তু মুহূর্তে তার সমস্ত অহং চূর্ণ হয়ে যায় দশ বারো জনের গর্জনে — "মোহন তাঁতী যে জাত লুটে নিচ্ছে রে কানা বুড়ো। দেখ গিয়ে যা।"(পৃ.১৬৭) — এই বিদ্রূপ মুখর বাক্যে কুঞ্জর চেতনা জাগ্রত হল। সত্যিই তার মেয়ে জবার হৃদয় তখন দয়িতের অপেক্ষায়। এবার জবার ভুল ভাঙ্গার পালা। তাঁতী পাড়ার মোহন চৌকিদারের ভালোবাসার আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে অতীত বর্তমান ভুলে, বংশ ও জাতের সম্মান এর কথা ভুলে গিয়েছিল জবা। সেই মুহূর্তে চাষীদের সমস্বরে জবার সম্বিত ফিরে আসে। নিজেই বুঝতে পেরে বলে — "এই ধরিত্রী ছুঁয়ে দিব্যি লিচ্ছি, আর কখনও আমি দোষ করব না। আর ভুল হবেক নাই।"(পৃ.১৬৮) — চাষীপাড়ার সমস্ত আভিজাত্য রক্ষার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয় জবা। মোহন তাঁতীর ভালোবাসার দানকে অগ্রাহ্য করে রাতের অন্ধকারে বিবসনা মৃত্তিকাবধূর দলকে সঙ্গে করে রোপাই সারতে গিয়েছে মাঠে। প্রায় ভোরের আলো এসে তমসা কাটিয়ে দেবার সময় হয়ে গিয়েছে, সে সময় মোহন দাস দেখতে পায় — 'টুকরো টুকরো কানি চট কাঁথা — মধ্যদিনের মত রুচি পরমাদ, আজ রাত্রের মত পরম অবহেলায় ওরা ঘরেই ফেলে রেখে এসেছে, ওদের লজ্জা ঘিরে রেখেছে লক্ষ কালো সুতোর জালে তৈরী এই নিঃসীম অন্ধকারের পরিচ্ছদ।" (পৃ.১৭১) প্রায় একই বিষয়কে নিয়ে গল্প রচনা করলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের শেষে যে ভাবে সমাজ রূপ দুঃশাসনের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন সেই জীবনদর্শন থেকে সুবোধ ঘোষ পরিবর্তিত জীবন দৃষ্টিতে সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে জীবনের বেঁচে থাকার পথ দেখান। যুগ সঙ্কটকে অতিক্রম করে দিনের আলোয় পৌছনর ইঙ্গিত দেন এই গল্পে।

নানা রূপে সুবোধ ঘোষ জীবনের সন্ধান করেছেন। এই সন্ধানের একটি দিক নারী পুরুষকে তার রূপে ভোলাতে চায়, সে চায় পুরুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত হতে। 'গরল-অমিয় ভেল' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মালা বিশ্বাস। কালো মোটা চেহারায় মুখে বসন্তের দাগসহ তার অদ্ভুত রুচি নিয়ে সে পুরুষকে আকৃষ্ট করাতে চায়। নিজের অহংবোধকে আঁকড়ে ধরে মালা বিশ্বাস সকলের মাঝে থেকেও সকলের থেকে দূরে

অবস্থান করে। রূপ তার নেই, অথচ নিজেকে মেলে ধরে পুরুষকে আকাঙ্ক্ষা করে। সমাজের লোকেরা নারীর এই উৎকট কামনাকে উপভোগ করে। তাই মালার বেশভূষা ও চালচলন রানী ঝিলের সকলেরই আলোচ্য বিষয়। রানী ঝিলের বাতাসে একদিন আলোড়ন উঠল। ঝিলের পাশে কালো পাথরে লেখা মন্তব্যে শহরের রূপবতী নারী-পূর্ণিমা, সুধা, প্রীতির নাম উঠে আসতে লাগল। মালার মনোজগৎ কিন্তু পরিবর্তিত হতে থাকল। পূর্ণিমা প্রথম থেকেই মালার প্রতিদ্বন্দ্বী। কারণ দুজনের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। মালা বিশ্বাস মনে করে রূপবতী নারীদের অহংকার এবার চূর্ণ হল, কিন্তু বাস্তবে সে দেখে খবরের শিরোনামে অবস্থিত ঐ তিন নারী এক সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মালা বিশ্বাস আহত হয়, কারণ সেও চায় পুরুষের কাঙ্ক্ষিতা হতে। তাই যে গরল পান করলে তার সর্বনাশ হবারই সম্ভাবনা তাকেই অমৃত মনে করে নিজেও পান করে। পূর্ণিমা বসু ও অন্যান্য নারীদের নামে লেখাগুলি কোন্ রূপমুগ্ধ প্রেমিক রচনা করেছে তার কোন সন্ধান পাওয়া না গেলেও সার্থক এক জীবনের খোঁজ পেতে মালা নিজেই একদিন খড়ির আঁচড়ে কালো পাথরটির গায়ে চিহ্ন এঁকে দেয়, "মালা বিশ্বাস, তোমায় দূর থেকে সেলাম করি। এক দুই তিন চার ... থাক্, বেচারাদের নাম আর করবো না। কত পতঙ্গের পাখা পুড়ে গেল। আর সংখ্যা বাড়িও না। তোমার চিঠির তাড়া রানী ঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সুস্থির হও।"(পৃ.৯৩) — মালা জানে কোথাও কোন পুরুষ তার জন্য অপেক্ষা করে নেই তবুও সে প্রার্থীতা হবার বাসনায়, কামনার লীলাকুরঙ্গী হতে নিজের হাতে গরল পান করে। তার বিশ্বাস এই গরল তার জীবনে অমৃত হয়ে উঠে আসবে। নারীর এ মনস্তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে। স্টোভ, 'সাপ' প্রভৃতি গল্পে নারীর মনোবিকারের রূপ। কল্লোলের লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র একসময় লিখেছিলেন — "মানুষের মানে চাই — গোটা মানুষের মানে!/রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত -/ গোটা মানুষের মানে -" [১৬] গোটা মানুষকে খুঁজতে গিয়ে তিনি নারীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। 'স্টোভ' গল্পে মল্লিকার নিজের ভেতরে লুকিয়ে রাখা ক্ষোভ, অসন্তোষ; কূট বিদ্বেষ — এসবেরই এক বিস্ফোরক আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। মল্লিকাই তাকে টেনে বের করে এনেছে বিপজ্জনক স্টোভটির মতো। এ তার নিজেরই অন্তঃকরণের জিনিস। একে সামলাতে হবে নিজেই। 'সাপ' গল্পেও রাঙা বৌদির সঙ্গে স্বামী উমেশের ঘনিষ্ঠতা সহ্য করতে না পেরে উমার মন বিষিয়ে উঠেছে। ভাঁড়ার ঘরে বিষাক্ত একটি সাপ আছে জানতে পেরেও রাঙা বৌদি যখন তার বৃদ্ধ স্বামীর জন্য মধু নিতে এসেছে মল্লিকা তাকে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে অনায়াসে। উমার মনোজগতের বিষিয়ে ওঠা ভার লাঘব করতে রাঙা বৌদি এগিয়ে আসে। দেশলাই এর আলোতে সাপটি দেখে উমার বিকৃতি সে উপলব্ধি করেছে, কুপি জ্বালিয়ে সে একাই সাপ মারতে চলেছে। উমা মধু খুঁজে দিতে চাইলে সে বলেছে — "তোকে আসতে হবে না। ঘরে একটা সাপ আছে।" (১৯৬, নির্বাচিত) — ঈর্ষা, কাম, লোভ এসব নিয়েই যে মানুষের সামগ্রিক সত্তা এ তত্ত্ব ভুলে যান না কল্লোল পরবর্তীকালের লেখক সুবোধ ঘোষও, তিনিও নারীর অন্তঃকরণে লুকিয়ে থাকা প্রবৃত্তিকে প্রকাশ

করেন যদিও তার রীতিটি পৃথক।

'বারবধূ' গল্পেও পঞ্চীবিবি চরিত্রের মধ্য দিয়ে মনোবিকার নয় সুবোধ ঘোষ নারীর হৃদয়ে প্রেমাকাঙ্ক্ষার রূপ ব্যাখ্যা করেন। প্রসাদ যৌবনের উদ্দীপ্ত কামনা বাসনাকে নিপুণ ছদ্মের আড়াল দিয়ে ভোগ করে। পঞ্চীবিবি ওরফে লতাকে নিয়ে বরাকর কলোনির একান্তে মধুনীড় রচনা করেছে। অথচ লতা প্রসাদের কাছে সমাজ প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা লাভ করতে পারে না। দেহপসারিনী লতাও দিনের পর দিন প্রসাদের স্ত্রীর অভিনয় করে। প্রথম পর্বে সে নিজেকে শুধুমাত্র প্রসাদের রক্ষিতা বলেই মেনে নিয়েছে। একারণে বাইরের বারান্দায় লোকজনের চাপা গলার আওয়াজ পেয়ে ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে ওঠে প্রসাদ, তখন অনায়াসে লতা বলে ওঠে — "আমাকে মিছে ভোগাও কেন? আমি ওসবের কি ধার ধারি?"(পৃ.১৪০) — কিন্তু এরপরই আভার আগমনে লতা তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। মিথ্যা পরিচয়ে সামাজিক মানুষের কাছে যে সম্মান ও স্নেহ সে পেয়েছে তা তার সমস্ত সত্তাকে অধিকার করে বসে। তাই আভার প্রতি প্রসাদের আকর্ষণ এবং লতা প্রসাদের স্ত্রী জেনেও আভা যখন প্রসাদকে কামনা করে তখন লতার বারবণিতা মূর্তির ভেতর থেকে জেগে ওঠে বধূ সত্তা। কিন্তু ভদ্রয়ানার মুখোশ আঁটা প্রসাদ তাকে অপমান করলে, এক তাড়া নোট দিয়ে তাকে ফেরৎ পাঠাতে চেয়ে যখন বলে "আমি তো তোমাকে কখনো ঠকাইনি-ক্ষতি করিনি।" — উত্তরে লতার বধূ সত্তার বিস্ফোরণ — "মাথার ওপর কাপড়টা বড় করে টেনে দিয়ে লতা বললো-না, তুমি ক্ষতি করবে কেন, আভা ঠাকুরঝি আমার এ সর্বনাশটা করলে।" (১৫২, শ্রেঃ গঃ) — আভার যে সামাজিক মর্যাদা রয়েছে লতার তা নেই। কিন্তু লতার নারী সত্তা কামনা করে সুখের একটি ছোট্ট নীড়। যেখানে স্বামী পুত্র নিয়ে সে বাস করবে। কিন্তু বারাঙ্গনার পক্ষে এ কামনা শুধুই অর্থহীন।

নারী মনস্তত্ত্বের অপর একটি গল্প 'কৌন্তেয়'। মহাভারতের অনুষঙ্গ ব্যবহার করে গল্পের নামকরণে সুবোধ ঘোষ যে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন মূল গল্পটিও একই রকমভাবে বারংবার মনে করিয়ে দেয় মহাভারতের কুন্তীর প্রসঙ্গ। পৌরাণিক এ বিষয়টি যেভাবে সাধারণের চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ষাট বছরের বৃদ্ধা সুহাসিনী পল সেভাবেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টানটান উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। তবে 'ভারত-প্রেমকথা' বা 'পরশুরামের কুঠার' গল্পে যেভাবে Myth ব্যবহৃত হয়েছে 'কৌন্তেয়' গল্পে ততটা গুরুত্ব পায়নি। সুহাসিনী পলের পেশা হল - বাঙালী পাড়ার ভিতরে প্রবেশ করে বেছে বেছে ভালো বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়ানো - ভিক্ষাবৃত্তিই এর নামান্তর। চ্যারিটির নাম করে বাড়ি বাড়ি থেকে টাকা তুলে এন্টালি বাজার থেকে থলি ভর্তি করে জীবন যাপন করে। তার এই ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে আরো একটি বিষয় যুক্ত করে সুহাসিনী পল চ্যারিটির অর্থ বাড়ানোর ফন্দি আটে। ইঞ্জিনিয়ার মাধব দত্তের কাছে এসে একটি নিখুঁত গল্প রচনা করে শুনিয়ে দেয়। যা থেকে মাধব দত্তের মনেও একরকম বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করে সুহাসিনী পলই তার মা। অতীত জীবনে ৩০ বছর বয়সের 'ভালোবাসার লজ্জা' মাধব

কে সুহাসিনী পরের কাছে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু স্নেহের দাবি নিয়ে, মাতৃত্বের দাবি নিয়েই সে বারবার ফিরে আসে সন্তানের কাছে। কুমারী কুন্তী তার ভালোবাসার লজ্জাকে বিসর্জন দিয়েছিল কিন্তু মাতৃত্বের হাহাকার তার হৃদয়ে যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল তা পূর্ণ করতেই ফিরে এসেছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগের দিন সন্ধ্যায়। মিস সুহাসিনী পল তার সম্মানের ভয়ে তার সন্তান মাধবকে অরফ্যানেজে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল — এরকম এক মিথ্যে গল্পের ফাঁদে পা দেয় শিক্ষিত মাধব দত্ত। মাধব দত্ত যেদিন সুহাসিনীর কেবিনে প্রবেশ করেছে সেদিন যেন 'একটা শিশু প্রাণের মতো ধুক পুক করছে মাধবের ত্রিশ বছর বয়সের প্রাণ।' (২৮০, ৪র্থ) মাধব দত্তের অস্তিত্ব ও তার চেতনাকে প্রায় নিংড়ে নিতে শুরু করেছিল সুহাসিনী পল। কিন্তু তার লোভী শকুনের প্রাণটি ভিক্ষাবৃত্তির পথ ভুলতে পারে না। যে স্নেহ মমতার বাক্য বর্ষণ করছিল এতক্ষণ ধরে মুহূর্তেই তা ভুলে গিয়ে মাধবের হাত থেকে নোটগুলি ছোঁ মেরে নিয়ে ''অন্ধকারের বিবরে অদৃশ্য হয়ে যায় সুহাসিনী' — এই অন্ধকার আসলে সুহাসিনীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। সুবোধ ঘোষের বিষয় নির্বাচন এবং বাক্যগঠনের টান টান উত্তেজনায় নারী মনস্তত্ত্বের আরো একটি দিক ওঠে আসে। নিজের ভিক্ষাবৃত্তিকে টিকিয়ে রাখতেই মিস সুহাসিনী অভিনয় করেছে, তার মনোগহনের চোরা পথে সুবোধ ঘোষ পরিভ্রমন করেছেন।

যে আদালতের ওপর সাধারণ মানুষ ন্যায়দণ্ডের প্রার্থনা করে, সেই যখন ন্যায়বিচারের পরিবর্তে গুরুদণ্ড প্রদান করে তখন আদালতের ক্রুর দানবিক দিকটি সাধারণের নজর এড়ায় না। সুবোধ ঘোষ সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে 'মা হিংসী' গল্পের বিষয় নির্বাচন করেন। নিম্নবিত্ত শ্রেণী গোপ জাতির একজন গিরধারী গোপ। আদালতে তার নামে মামলা চলছে। বহু সাক্ষ্য প্রমাণের পর দায়রা জজ রায় দেন আসামী গিরধারী গোপ বহুদিন আগে থেকেই হিংস্র হয়ে উঠেছিল। প্রতিবেশী শনিচরীর প্রতি আকৃষ্ট গোপী শনিচরীকে কুপ্রস্তাব দিলে সে তা মানতে রাজি হয়নি। শনিচরীর গলার ওপর হেসো দিয়ে তিনটি পোঁচ দেয় গিরধারী। এই হত্যাকাণ্ডের পর সে পালিয়ে গেলেও পাঁচদিন পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বহুদিন মামলা চলার পর আসামীর স্বীকারোক্তি ও নানা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে জজ রায় দেন — ''এক্ষেত্রে আসামীর প্রতি সুবিচার করার জন্যই আমি তাকে চরম দণ্ড — প্রাণদণ্ড দিলাম।''(পৃ.১৬৭) — জজের মুখে এই বিধানকে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন। প্রতিহিংসাবশত গিরধারী একটি প্রাণকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছে যেন। গিরধারী গোপের ফাঁসী হবে। সান্ত্রী, ওয়ার্ডার, হাবিলদার, জহ্লাদ, জেলর প্রত্যেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। একটি প্রাণকে ফাঁসীতে ঝোলাবার নিখুঁত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অথচ গিরধারী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে রয়েছে, ''যত খুসী আপশোষ করুন আপনারা, কিন্তু আমি জানি, আমার ফাঁসি হবে না।'' (পৃ.১৭০) জেলের সকলেই ভেবেছে গিরধারীর মাথা খারাপ হয়েছে নিশ্চয়ই। অবশ্য গিরধারীর ফাঁসী হলই। ফাঁসির পর গিরধারীর বিকৃত চেহারার বর্ণনা লেখক যেভাবে দিয়েছেন, একই সঙ্গে রাধিকার ধিক্কার — ''গিরধারীর আধ হাত লম্বা জিভ আর দড়ির

মত লিকলিকে গলাটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।"(পৃ.১৭৯) — রাধিকা সকলের সামনে চিৎকার করে বলে — "মাপ কর, তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না, মাপ কর।"(পৃ.১৭৯) সমস্ত পৃথিবীর প্রতি আড়চোখে দেখে রাধিকা আঁৎকে উঠেছে গিরধারীর বিকৃত চেহারা দেখে। ধিক্কার দিয়েছে সামাজিক এই ঘৃণ্য ব্যবস্থাটিকে। আগেই সে এমনটা আশঙ্কা করেছে, তাই তো গিরধারীর চেহারা যাতে বিকৃত না হয় সেজন্য বিষের হালুয়া নিয়ে এসেছিল। রাধিকার হাতের হালুয়া খেতে দেওয়া হয়নি ফাঁসির আসামী গিরধারীকে। বরং খুনী বলে রাধিকাকেও পুলিশের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করে ওয়ার্ডারেরা, সে মুহূর্তে রাধিকার স্পষ্ট জবাব — "আমার স্বামীকে ফাঁসি থেকে বাঁচাতে এসেছিলাম রে মুখপোড়া।"(পৃ.১৮০) — সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদে সুবোধ ঘোষের গল্পটি সম্পূর্ণ অভিনব। একই ভাবনার পরিণত রূপ লক্ষ্য করা যায়, রমাপদ চৌধুরীর 'খুনী বউ' গল্পে। গল্পকথক তাঁর নিভাদিকে খুনী বউ এর পরিচয়ে গল্পে উপস্থাপন করেছেন। যেদিন প্রথম নিভাদি মধু স্যাকরা লেনের একতলায় এসে উঠেছে, সেদিন থেকেই তার উদাস দৃষ্টি গল্পকথকের কৌতূহল জাগিয়েছে। ধীরে ধীরে প্রকাশ হয়েছে ফাঁসুড়ে জজের আদালতে নিভাদির স্বামী রতন চাঁদের বিচার চলছে। নিভাদি ও তার বাবা তাদের সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়ে এই মামলা চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব ইতিহাস থেকে জানা যায়, একটি মেয়ের সঙ্গে রতনচাঁদের ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। হঠাৎই কলঙ্কের বিভীষিকা দেখেছে রতন চাঁদ, সেই কলঙ্ক অপসারণের সময়ই মেয়েটির মৃত্যু ঘটে, যে অপরাধের মূল নায়ক রতন চাঁদ। সমস্ত ঘটনা জেনেও নিভাদি তাঁকে বাঁচাতে চায়। একদিন সকলেই বিস্মিত হয়ে শুনতে পেল রতন চাঁদ খালাস পেয়েছে। সেদিন নিভাদির দুচোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়েছে। রাধিকার মতই নিভাদি যেন ফাঁসুড়ে জজের হাত থেকে স্বামীকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। পরদিন সকালেই শোনা গেল রতন চাঁদ আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু নিভাদির দৃষ্টি এবং খিলখিল হাসির মধ্যে গল্পকথকের কাছে যে সত্য প্রকাশ পেল তার সঙ্গে রাধিকার ইচ্ছের মিল খুঁজে পাওয়া যায় — "ক্ষমা? ক্ষমা করতে হবে? জানো, দুশ্চরিত্র পুরুষ আমার দু'চক্ষের বিষ। হ্যাঁ, বিষ, বিষ।" রাধিকা পারেনি সরকারী আইনের কঠোর ব্যবস্থা থেকে স্বামীকে বাঁচাতে, বিষের হালুয়া তার স্বামীর কাছে পৌঁছয় নি, কিন্তু নিভাদি ফাঁসুড়ে জজের হাত থেকে, নির্মম মৃত্যুর হাত থেকে রতন চাঁদকে মুক্তি দিতে পেরেছিল। এমনকি তার অপমানের, সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার প্রতিশোধও নিতে পেরেছে নিভাদি। কিন্তু দুটি গল্পেই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী গত মিল অবশ্যই রয়েছে, একটি মানুষ ক্রোধান্ধতার বশে খুন করতে পারে, কিন্তু তাই বলে সমাজের আইন ঠাণ্ডা মাথায় চক্রান্ত করে একজনকে খুন করতে পারে না। এরই বিরোধিতা গল্প দুটির মূল বিষয়।

'দণ্ডমুণ্ড' গল্পের মূল বিষয় একেবারে ভিন্ন স্বাদের। রামপুর সেন্ট্রাল জেলের সান্ত্রী অনুকূল রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবীর রাজা হয়ে যায়, অর্থাৎ দণ্ড-মুণ্ডের মালিক সে। তার চ্যালেঞ্জের হাঁকে অন্ধকার কম্পিত হয়, কমিশনার সাহেবের গাড়ি থেমে যায়। সারা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা অনুকূল সরকারী উর্দি

গলায় চাপিয়ে আইনের মানুষ সেজে থাকে। 'আইনকানুন ওর আত্মা' — তাই আইনের রীতি মেনে জেলের সেপাই বা ওয়ার্ডারদের শাসন করে চলে। অনুকূলের শাসনে তারা সন্ত্রস্ত যদিও তার আড়ালে তাকে ব্যঙ্গ করতেও তারা অভ্যস্ত। আইনই যার আত্মা সেই অনুকূল এক অন্ধকার রাত্রির কাছে যেন পরাজিত হয়। ডিউটির নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মনে হল গোপী দোসাদের ফাঁসি আজ, গোপীর মা এসেছে তার লাশ নিয়ে যাবার জন্য, সঙ্গে রয়েছে গোঁপীর একমাত্র পুত্র হাবা। ওয়ার্ডের সকলেই গোপীর মার সঙ্গে গল্প জমাবার চেষ্টা করে, কারণ গোপীর ডাকাত হবার পেছনে যে ইতিহাস রয়েছে সে ব্যাপারে কৌতূহল রয়েছে সকলের। কর্তব্যে নিষ্ঠাবান অনুকূল গোপীর ডাকাত হবার ইতিহাস শোনে অন্য সকলের সঙ্গে। এই ইতিহাস নিতান্ত ক্লিন্ন। ছোটবেলা থেকেই খাদ্যরসিক গোপী জীবনের সঙ্গে লড়াই করেছে বহুভাবে। কখনো লেঠেল রূপে, কখনো করাত টানার কাজে নিযুক্ত থেকে, কিন্তু তার বীরত্ব তাকে তার স্বরূপ প্রকাশ করতে বাধ্য করে, সে পরিণত হয় গোপী ডাকাতে। গোপীর স্ত্রী যেদিন গঞ্জে গিয়ে ধর্ম খুইয়ে এসেছে সেদিনই টাঙ্গির আঘাতে গোপী তাকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। এরপর সব স্পষ্ট হয়ে যায়। গোপীর ডাকাত হবার পেছনে যে যন্ত্রণা ছিল তাকে ভুলে গিয়ে অনুকূল গোপীর বীরত্বকে দেখতে পায় — "না, মরা কুমীর নয়। যেন লড়াইয়ে ঘায়েল জবরদস্ত এক সেপায়ের লাশ, সাদা কফিনে ঢাকা।" (১১০ পৃ.) অনুকূল কিন্তু তার সান্ত্রী সত্তা ভুলে গিয়ে, পৃথিবীর অপরাধের বোঝা কমাতে গোপীর লাশ কাঁধে তুলে নিল। তার আইনী আত্মার আড়ালে যে সত্তাটি চাপা পড়েছিল প্রকৃত বীরের প্রতি সম্মান জানাতে গিয়ে সেই মানবিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল। অনুকূল এবার ফিরে যেতে চায় ঝালদার বটের ছায়ায়, যেখানে তার শান্তির নীড় বাঁধা আছে। যে ছিল একদিন সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, আজ তারই ওপর এসে পড়বে আইনের খর্গ, ডিসমিস হবে অনুকূলের চাকরি এরকম ভয়ে ভীত সকলেই অনুকূলকে বাধা দিতে চায়। কিন্তু অনুকূল সব কিছুকে অতিক্রম করে গোপীর লাশ কাঁধে তুলে নেয়।

সুবোধ ঘোষের বেশ কিছু গল্পে মধ্যবিত্তের ভণ্ডামির চেহারা ফুটে উঠেছে, কখনো বা তিনি মধ্যবিত্তের উত্তরণের অবকাশ রেখেছেন গল্পে। 'আত্মজা' গল্পটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে এ সত্যই প্রমাণিত। উপেনবাবু ও চারুবালা জন্ম দিয়েছে রমাকে, অর্থাৎ আত্মজা বলতে তারা রমাকেই বোঝে। অম্বি বা অম্বালিকা তাদের পালিতা কন্যা। কুড়ি বছর আগে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নীচ জাতির মেয়ে অম্বির দায়িত্ব নিয়েছে। পরবর্তী কালে অনেক বারই অম্বিকে ত্যাগ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু স্নেহের শেকলে বাঁধা মন পারেনি অম্বিকে ছেড়ে দিতে। অথচ সমাজের সকলের কাছেই অম্বির পরিচয় 'মেয়ে নয় - মেয়ের মত'। তাই রমাকে যখন পড়াশোনা, গান বাজনা ও শেলাই শেখানো হয়েছে অম্বিকে তার কোন শিক্ষাই দেওয়া হয়নি। অথচ অম্বি রমার দেখাদেখি সমস্ত বিষয়কেই আয়ত্তে এনেছে। দুজনে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চারু-উপেন চিন্তিত হয়ে পড়ে এদের বিবাহকে কেন্দ্র করে। রমার বিয়ে দিতে গেলে অম্বিকেও যে দিতে হবে। কিন্তু অম্বির জন্য চাই

অম্বিরই জাতের ছেলে। এমন সময় অধীর আসে এবাড়িতে রমা ও অম্বি দুজনকেই সে দেখেছে। আর অম্বির সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। অম্বির জীবন-ইতিহাস, জাতের ইতিহাস শুনেও অধীর অম্বিকে ভালোবেসেছে। এরকম প্রস্তাবে চারু বা উপেন কেউই প্রসন্ন হতে পারেনি। অম্বির অন্তরাত্মা আম্মি আপ্পির প্রতি পরম মমতায় সিক্ত। তাই তার দুশ্চিন্তা রমার বিয়ে হয়ে গেলে তাদের বাবা, মাকে কে দেখবে? তার করুণ প্রার্থনা — "আমাকে পরের বাড়ি পাঠিও না। আমি চিরকাল এখানেই থাকব। যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে ততদিন আমিও বেঁচে থাকব।"(পৃ.১৯০) — মা, বাবার জন্য অম্বির এই উদ্বেগ মেয়ের চেয়ে বড় একটা সত্তার ব্যাকুলতা বলে মনে হয়েছে উপেনবাবুর। সমাজে নিজেকে বড় করে দেখাতে একসময় অম্বিকে গ্রহণ করলেও নীচ জাতির কন্যাকে মেয়ের মর্যাদা দিতে পারেনি কিন্তু "অকস্মাৎ এক বিস্ময়ের ঝড় এসে যেন তাঁর মনের যত ভুলের আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।" (১৯০ পৃ.) এখানে এসেই মধ্যবিত্তীয় মানসিকতা থেকে উত্তরণ ঘটল উপেনবাবুর। অম্বিকে তারা মেয়ে রূপে স্বীকৃতি দিল। 'আত্মজা' নামে একটি উপন্যাসও রচনা করেছেন সুবোধ ঘোষ। সেখানে অম্বিকে মেয়ে রূপে স্বীকৃতি দেবার বিষয়টি উল্লেখ্য তবে এরই সঙ্গে জাতিগত বিদ্বেষ ও বিন্যাসকে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যে প্রমাণ করতে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর মতাদর্শকেও যে মেনে নিয়েছেন সে ব্যাখ্যা করা হবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

'তিলাঞ্জলি' উপন্যাস লেখা শুরু করবার আগেই সুবোধ ঘোষ রচনা করেছিলেন 'নতুন শালিক' নামক একটি গল্প। তিলাঞ্জলি লেখার কয়েক মাস আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটির প্রতিবাদ করেছিলেন বলে জানা যায় সুবোধ ঘোষের 'সেদিনের আলোছায়া' গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, "মানিকবাবু পাল্টা জবাব কিংবা প্রতিবাদ হিসাবে একটি গল্প লিখলেন হ্যাঁলা।... আমি বুঝতে পারিনি এবং আজও বুঝতে পারিনা, আমার 'নতুন শালিক' গল্পের প্রতিবাদ কেন করেছিলেন মানিকবাবু। 'নতুন শালিক' গল্পটি দীন সাধারণের শ্রেণী স্বার্থের একতাযুক্ত সংহতির সমর্থন, এবং সংগ্রামের পুরোভাগে কপট বিপ্লবী বুর্জোয়ার চতুর অনুপ্রবেশের প্রতিবাদ।" [১৭] 'নতুন শালিক' গল্পে রঘুনাথবাবুর মেয়ে সুধা কলেজে পড়ে, একই সঙ্গে সে সমিতির সেবাকর্মিনী। মেয়ের এই আদর্শবাদ রঘুনাথবাবুকে স্বপ্ন দেখায়। কারণ সুধার আদর্শ আন্তর্জাতিকতার আদর্শ। তার মতে — "আমরা সবদেশের দুঃখীদের মুক্তি চাই, সর্বজাতির পীড়িতদের সেবা করতে চাই। আমাদের বিশ্বাস, পৃথিবীর পীড়িতরা সবাই মিলে যে একটি জাত।" (পৃ. ৯৭) — পার্টি আর সমিতির কর্মিনী সুধার মানসিকতা এতটাই উচ্চকোটির যে রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয়-প্রার্থিনীদের জন্য নিজ হাতে রান্নাও করে দেয়। সুধা হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করে তাদের সমিতির এক নতুন সদস্য মীর্ণা রায়, তারই বাড়ির সামনে The Sunny Nook এর বাসিন্দা। মীর্ণা ও তাকে ঘিরে কমিউনিস্ট পার্টির ভাবধারা দেখে আহত হয় সুধা। মীর্ণা রায় এই সমিতিতে মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়ে থাকে। মীর্ণা তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে যে পন্থা অবলম্বন করেছে সেটি বস্তুত এক চক্রান্ত। সুধার বাড়ির কুকুর নেলো

এবং মীর্ণাদের কুকুর টেরিয়ারের যেদিন লড়াই বেঁধেছে, লড়াই-এ-নেলোর মুমূর্ষু অবস্থা দেখে ছুটে এসেছিল সুধাদের 'নতুন শালিক' নামক গরুটি। তার তীক্ষ্ণ শিং বাঁকানো দেখে ভয়ে পালিয়েছিল টেরিয়ার। সেদিনই মীর্ণাও ভয় পেয়েছে, এই ভয়টা উলঙ্গ সত্যের ভয়। কমিউনিস্ট পার্টিতে বড় অঙ্কের চাঁদা দিলেও তার মধ্যে কোন আদর্শ নেই। অন্যদিকে আদর্শবাদী সুধা মনে প্রাণে কমিউনিস্ট পার্টির ভক্ত। সে রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে, জাতির মুক্তির স্বপ্ন দেখে। এই রুশ বিপ্লবের ইতিহাস মিথ্যে নয়, একসময়কার কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস ভন্ডামির আড়ালে, ছদ্মবেশের আড়ালে এক মিথ্যেকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এসত্য যখন উদ্‌ঘাটিত হয় তখন সমিতির জরুরী বৈঠকে এক প্রস্তাব পেশ করা হয় এবং জানা যায় সেই প্রস্তাব পাঠিয়েছে মীর্ণা। — "সমিতির আন্তর্জাতিক সেবার আদর্শে অনেক বদজাতির ভেজাল ঢুকতে আরম্ভ করেছে। সভ্যতালিকা পার্জ করা হোক। সন্দেহ ভাজনদের নাম রিপোর্ট করতে একটি কমিটি গঠনের আজ্ঞা হয়।" (১০১ পৃ.) - মুহূর্তের মধ্যে সুধার চোখের সামনে পরিস্কার হয়ে যায় সুধাকে লক্ষ্য করেই মীর্ণার এই প্রস্তাব। সে বুঝতে পারে প্রস্তাব সমর্থনে এবারই তাকে শেষবারের মত হাত তুলতে হবে। তবুও সে হাত তোলে। সে তার আদর্শকে শ্রদ্ধা করে, কমিউনিস্ট পার্টির ভন্ডামিকে সে ধরে ফেলেছে। মধ্যবিত্তের ভন্ডামি দেখাতে দেখাতে কমিউনিস্ট পার্টির ভন্ডামিকেও সুবোধ ঘোষ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

"সুবোধ ঘোষ মহাশয় শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন একনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক। তাঁর কথায়, কর্মে, রচনায় আচরণে গভীর দেশপ্রেম উৎসারিত হত। সেই দেশপ্রেমের ভিত্তি ছিল নিবিড় মানবপ্রেম যা সংকীর্ণতামুক্ত এক দরদী মনের পরিচয় দিত।" [১৮] প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র 'জাতীয়তাবাদী লেখক' প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে মন্তব্যটি করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁর রচনাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রূপে তিনি অপরের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে সক্রিয় হয়েছিলেন। এমনকি কিছু কিছু সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যও লেখকের গভীর দেশাত্মবোধের মর্মে লুকিয়ে রয়েছে। মহাত্মা গান্ধী, তাঁর আদর্শ ও জাতীয় কংগ্রেসের ভাবধারায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত সুবোধ ঘোষ আগষ্ট আন্দোলনের মহান সংগ্রামকে বিশেষ তাৎপর্য দিয়েছেন। 'শিবালয়', 'কর্ণফুলির ডাক' এবং 'কালাগুরু' গল্প প্রাক্ স্বাধীনতাপর্বের সেইসব আন্দোলনের ছায়ায় পরিপুষ্ট। অথচ বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরত থাকাকালীন তিনি যখন তাঁর প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' লেখেন তখন তিনি কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই যখন তাঁর 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসটি প্রকাশ পায়, সেখানে তিনি সম্পূর্ণভাবে কমিউনিস্ট বিরোধী মত পোষণ করেছেন। তাঁর সাহিত্যে কংগ্রেসী মতাদর্শের প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করে অনেকেই তাঁকে গান্ধীবাদী আখ্যা দিয়ে থাকেন। সুবোধ ঘোষ অবশ্য স্বয়ং তাঁর 'অমৃতপথযাত্রী' গ্রন্থে বলেন সারাজীবনে তিনি বহু মনীষীর কথাই বলেছেন, ফলে গান্ধীজির জীবন নিয়ে লেখা কোন গ্রন্থ তাঁর রচিত মানে এই নয় যে, তিনি গান্ধীবাদে বিশ্বাসী। সাহিত্যে কোন বিশেষ 'ism'

সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তবে তাঁর বেশ কিছু লেখায় গান্ধী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে।

'শিবালয়' গল্পটিতে এরই ছায়া লক্ষিত হয়েছে। নতুন সরাই এর ছোট বস্তিতে অনন্তরাম মুদির দোকান দিয়ে তার স্ত্রী প্রমিলাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে। পথ চলতি মানুষের প্রয়োজনের নানা উপকরণ যোগান দেয় অনন্তরাম। কিন্তু কোন কোনদিন সে আবিষ্কার করে সারাদিনে কিছুই তার বিক্রী হয়নি, বিলিয়েই গেছে শুধু। এমনকি সারাদিনের ক্লান্তির পর, পথযাত্রীদের সকলের দাবী মিটিয়ে এসে প্রমীলার প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির কোন হিসাবই রাখেনা। ক্লান্ত, বিষন্ন প্রমীলাও এক বুক স্বপ্ন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রির স্তব্ধতাকে জাগিয়ে রাখে অনন্তরামের 'রামচরিত মানস' পাঠ। গান্ধীবাদী-অনন্তরামের এই রামচরিত মানস পাঠ প্রমীলা সহ্য করতে পারেনা। তার অনুযোগ — "এই বইটাই তো আমার দুসমন।"(পৃ.১৮২) প্রমীলা অভিমান ভরেই স্বামীর রামচরিত মানসের বিপরীতে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার শিবালয়টিকে। যে শিবালয়ের প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে কৈলাসের আহ্বানে। অনন্ত স্ত্রীর অভিমান বুঝতে পেরে তাকে সতর্ক করে দেয় এভাবে — "বেচারা রামচন্দ্রজীর ওপর রাগ করেই কি শিবের পুজো ধরবে?... এরকম ভুল করোনা। রামজী হোক বা শিবজী হোক, মন থেকে যাঁকে চাও, তাঁরই পুজো কর।"(পৃ.১৮৩) — মদ্যপ কৈলাস প্রমীলার সংস্পর্শে আসবে বলেই নেশা ত্যাগ করেছে। শিবালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে এ বাড়ির পথ তার কাছে সহজ হয়ে গেছে। অন্যদিকে 'স্বরাজের লড়াই শুরু হয়ে গেছে'। জনগণের মিলিত কণ্ঠ ঘোষণা করছে 'কংগ্রেস কি জয়।... স্বতন্ত্র ভারত কি জয়।' অনন্তরাম নিজেও উপলব্ধি করে লড়াই শুরু হয়েছে। তার অন্তরে বাইরে এ লড়াই এর সূচনায় অহিংস আন্দোলনের পথে, সংসারের শিকড় ছিন্ন করে এগিয়ে যায়। মুখে তার মন্ত্র - "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।"(পৃ.১৯৮) — ক্ষিপ্ত জনতা কাছারী বাড়ি দখল করেছে। তাদের দাবি - "হঠ্ যাও হিন্দস্থানসে।... হঠ্ না হ্যায় তো হঠ্ যাও নেহি তো মর যাওগে।"(পৃ.১৯৮) — মেজরের রিভলবারের গুলি এক নিমেষে ছুটে এসে অনন্তরামের বুকের পাঁজর ঝাঝরা করে দেয়। এদিকে প্রমীলাকে কেন্দ্র করে কৈলাসের ভুয়ো শিবপ্রীতি প্রকাশিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রমীলা গভীর বিশ্বাসে শিবস্তোত্র পাঠ করেছে বলেই হয়ত ভিখারী শিব, শূন্য শিব কৃপা করে তাকে পথ দেখিয়েছেন। নিঃস্ব রিক্ত অনন্ত মুদি আজ প্রমীলার শিবে পরিণত হয়েছে। শহীদ অনন্ত মুদির রক্তস্রোত একখণ্ড মাটিকে রঙিন করে দিয়েছে। সেখানেই তীর্থ যাত্রীর মত প্রমীলা এসে লুটিয়ে পড়ল। সে তার ভগবানকে, ভালোবাসার শিবালয়কে দেখতে পেয়েছে এরই মধ্যে। সে তার সমস্ত অহংকার চূর্ণ করে নতুন সরাইয়ের 'অনন্ত মুদীর বউ' এ পরিণত হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দাম্পত্য জীবনের সংকট ও উপলব্ধির স্বরূপটি এভাবেই গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। অনন্তরাম-প্রমীলা-কৈলাস এই ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্কটি গান্ধী আন্দোলনের ছায়ায় ভিন্ন এক মাত্রা লাভ করেছে।

'কালাগুরু' গল্পের মিঃ টেনব্রুক সেখপুরা মহকুমার অফিসার পদে নিযুক্ত। আপাত দৃষ্টিতে

তিনি ভারতবর্ষকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। সেখপুরা অঞ্চলের সকল বিষয়েই তিনি সপ্রতিভ। ইন্ডোলজিষ্ট এই ব্যক্তিত্বের ঔদার্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর বক্তৃতায় — "আমার বুঝতে ভুল হতে পারে, হয়তো আমার জানার মধ্যে ভুল আছে, কিন্তু ইন্ডিয়ার আত্মাটিকে আমি একরকম চিনেছি, চিরধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার মত ভারতের সেই আত্মাটিকে আমি ভালোবাসি।"(পৃ.১৩২) — ভারতের আত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদন মিঃ টেনব্রুককে নতুন মানুষ রূপে পরিচিত করায়। স্থানীয় ছেলের দলের সঙ্গে মিশে উৎসাহিত ও চঞ্চল টেনব্রুক যেন ভারতীয় আত্মার সঙ্গে মিশে যান। টেনব্রুক তাঁর শাসন পদ্ধতিকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছেন। বাঙালী মনের ভীরুতা কাটাবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় 'কালচারের' গভীরে প্রবেশ করে তিনি আত্মাটিকে মেরে ফেলতে চান। ভারতবাসীর ভালবাসার যে শিকড় আত্মার গভীরে প্রবেশ করেছে তাকে উপড়ে ফেলতে চান তিনি। তাই বারংবার তাঁর শাসন পদ্ধতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় রূপান্তর। অন্যান্য সাহেবের মত শুধুমাত্র শাসন নয়, সকলকে আপন করে নিয়েছেন। ভারতবর্ষে যখন উত্তেজনার চরম সীমা লক্ষ্য করা যায়, তখন তিনি চান — "যে কোন বিবাদ বা প্রতিবাদ হোক, আলোচনা করে তার নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।" (পৃ.১৩৪) আপাত দেশভক্তির খোলসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা টেনব্রুকের স্বরূপটি এবার উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। কুড়িয়ে পাওয়া পাথরের ধূপদানে রোজ সন্ধ্যায় আধমুঠো কালাগুরু পুড়িয়ে সেখানে তিনি অনুভব করেন 'অদ্ভুত এক প্রাচ্য সৌগন্ধের যাদু'। টেনব্রুক ধৈর্য ধরেন, আর এই অতীতের মাদকতায় তিনি আচ্ছন্ন করে রাখতে চান মানুষদের, ভুলিয়ে দিতে চান তাদের বর্তমানকে। টেনব্রুক প্রকৃতপক্ষে শাসন করেন ভিন্ন এক কৌশলে। এই শাসনের মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতবাসীর ভালোবাসার শিকড়টি উপড়ে ফেলতে চান। তাই তিনি বিভিন্ন গল্প প্রচার করেন। স্বদেশের প্রতি ভারতবাসীর যাতে প্রীতি জন্মাতে না পারে সেকারণে তিনি স্থানীয় লোকের প্রচলিত গল্পকে পরিবর্তিত রূপ দান করেন। ডুমরীচকের ডাকবাংলোর কাছে যেখানে হাজার সিপাহীর বন্দী অবস্থায় প্রাণদণ্ড হয়েছিল টেনব্রুকের গল্পে সেই স্থানটি হয়ে যায় 'ব্রহ্মদত্ত নামে এক ঋষির আশ্রম।' অর্থাৎ পৌরাণিক প্রসঙ্গ টেনে এনে ভারতবাসীর হৃদয় জয় করে নেবার অদ্ভুত কৌশল অর্জন করেন। তাঁর নিজের প্রতি বিদ্রোহ গড়ে ওঠার শিকড়কে এভাবেই তিনি নষ্ট করে দিতে চান। বিদ্রোহ যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার তখন ভারতবাসীর অন্তরকে জাগ্রত করেছে, ঠিক সেই সময় কৌশলী টেনব্রুক ছোট ছোট বালকের মুখে নতুন গানের কলি ধরিয়েছেন। ছেলেরা একরকম বাধ্য হয়ে টেনব্রুকের ভালোবাসার কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে — "আমি যীশুর ছোট মেষ/ প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ।"(পৃ.১৩৭) — এই গানের প্রতিধ্বনি টেনব্রুকের কানে বাজতেই পরম নিশ্চিন্তে বাংলোয় চলে গেছেন। ইন্ডোলজিস্টের ছদ্মবেশে কলোনী শাসনের স্বরূপকে একটানে উদ্‌ঘাটিত করেন গল্পকার। একমুহূর্তে তাঁর বর্ণচোরা হিংসুক রূপটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সারা রাত ধরে পাহারা দিয়ে শিকারীর মত তাড়া দিয়ে স্বদেশীদের চরম শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নেন। গল্পের

শেষ দৃশ্যে আদালতের প্রাঙ্গন। দূর থেকে দেখছেন "মাথায় ব্যান্ডেজ, কোমরে দড়ি, হাতে হাত কড়া" বলাই। আগষ্ট আন্দোলনকে যেভাবে পিষে মারতে চেয়েছিলেন মিঃ টেনব্রুক, কিন্তু বলাই এর মত ছেলেরা 'কালাগুরুর' মত নিজে পুড়ে গন্ধ বিলাতে চায়। অন্যদিকে কালাগুরু পুড়িয়ে সুগন্ধ লাভের চেষ্টা যেমন টেনব্রুকের শুধুই অভিনয়, তেমনই ভারতের আত্মাকে ভালবাসার রূপটিও ধূর্ততারই নামান্তর।

সুতীক্ষ্ম সমাজবাস্তবতা, রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধির যুক্তিপূর্ণ মনোভাব প্রকাশে সুদক্ষ লেখক সুবোধ ঘোষ। ১৯৩৯ সাল থেকে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পাশাপাশি ভারতে বৃটিশ বিরোধী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সমাজ জীবনে যখন তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে ঠিক তখন সুবোধ ঘোষ এলেন সাহিত্যক্ষেত্রে। ১৯৪০ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় জাপানী বোমার বিস্ফোরণ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। সুবোধ ঘোষের কয়েকটি রচনায় এর প্রভাব পড়েছে। 'কর্ণফুলির ডাক' গল্পে সেই সামাজিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণ পরিস্ফুট হয়েছে। জাপানী বোমার আঘাত কলকাতার বুকে যে ইতিহাস গড়তে চলেছে তারই বিবরণের মধ্যে দিয়ে গল্পের সূচনা। ইতিহাসের শিক্ষক ধ্রুবেশ ছাত্রদের কাছে আদর্শের বাণী শোনায়। সাবধানী অভিভাবকেরা তাদের ছেলেদের ধ্রুবেশের সংসর্গ থেকে সরিয়ে রাখে। এদিকে যুদ্ধের ভয়াবহতাও সকলকেই ভাবিয়ে তোলে। কলকাতা ছেড়ে অনেকেই চলে যেতে থাকে। ধ্রুবেশ উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে, "ছাত্রেরা বাপ-মার হাত ধরে চলে গেল যত আপদহীন রাজ্যে।"(পৃ.৪০০) — কলকাতা ছেড়ে যাবার ব্যাপারে ধ্রুবেশ সম্পূর্ণ নীরব। দেখতে দেখতে তার চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরিটিও চলে যায়। তবুও ধ্রুবেশ শুনতে পায় 'নবযুগের ভোরের কাকলি"— অদ্ভুত এক অর্কেস্ট্রা যা লক্ষ পায়ের পথচলার ধ্বনি ও বোম্বারের গুরুগুঞ্জনের মিশ্রণে সৃষ্ট। সে যেন উপলব্ধি করে আগামী দিনের কোন এক কাকলির কলতান আহ্বান জানাচ্ছে নির্ভেজাল, যুদ্ধমুক্ত কোন এক সকালকে। সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডী তাকে বেঁধে রাখতে পারেনা। চাকরির সন্ধানে বেড়িয়েও সভা-সমিতির পক্ষ থেকে জ্বালাময়ী বক্তৃতা রেখে পরম তৃপ্তিতে ভরে ওঠে তার বুক। সে গর্ব অনুভব করে যখন চট্টগ্রামের বিরাজপুর, তার জন্মভূমি থেকে আহ্বান এসেছে তার কাছে। গ্রামের ছেলেরা তার নেতৃত্বে লড়াই করতে চায়। বৃদ্ধরা চায় ধ্রুবেশ তার পুত্র পরিজন নিয়ে গ্রামের মাটিতে ফিরে যাক। পরম আনন্দে ধ্রুবেশ তার নিজের বুকে একবার হাত বুলিয়ে নেয়। কিন্তু দারিদ্র্যের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়, কখনো কখনো যুদ্ধের পরিস্থিতিতে ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখতে এক ফোঁটা দুধ যোগাড় করতে না পারলে ধ্রুবেশকে গঞ্জনা দেয় তার স্ত্রী-রমা। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মেতে যে স্বামী সব কর্তব্য ভুলে গিয়েছে সেই দায়কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে রমা বলে — "শুনছো? টুটুর জন্যে এক গজ ফ্লানেল নিয়ে আসবে আজ।"(পৃ.৪০৫) — অবশ্য এই ক্ষুদ্র সংসারের বাইরেও যে বৃহৎ জগৎ আছে, এ উপলব্ধি যেদিন রমার অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলেছে সেদিন নিজের স্বার্থপরতা তার

নজর এড়ায়নি। রমা যেদিন এই সত্য উপলব্ধি করেছে সেদিন বিশ্ব ইতিহাসের কালোছায়া কর্ণফুলির জলে এসে পড়েছে — সেই জ্বালাভরা জলের ঢেউ অসহায়ের মত ডাকছে ধ্রুবেশকে। যার শিকড় কর্ণফুলির তীরে, তাকে উপড়ে ফেলা যায় না। সেকারণেই ধ্রুবেশ তার ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে চলেছে। ব্ল্যাক আউটের রাত্রিতে সারা কলকাতা যখন শব্দহীনতার মধ্যে ডুবে রয়েছে তখৰ ধ্রুবেশ সেই নিঃশব্দতার মাঝে হারিয়ে গেছে। স্বামীর প্রতি ক্ষোভ অভিমান সমস্ত ভুলে রমা সেদিন স্বামীকে সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম জানায়। শুধু ধ্রুবেশকে নয়, এই প্রণাম তাদের উদ্দেশ্যে — "মাটির মান বাঁচাতে জীবনপণে দাঁড়ালো আজ যারা।"(পৃ.৪০৭) রমা বোঝে কালের নিয়মে শত্রুর চণ্ড অভিযান একদিন থেমে যাবে তবুও বিরাজপুরের ঐ সড়কের ওপরে যে শোণিতাক্ত চুম্বন পড়ে থাকবে তা তার স্বামীর, বুলেটের আঘাতে শতদীর্ণ হয়েছে যে ইতিহাসের শিক্ষকের বুক। যুদ্ধের পটভূমিকায় ধ্রুবেশ ও রমার দাম্পত্য জীবনের রূপ যেভাবে এলো মেলো হয়ে গিয়েছিল তা প্রশান্তি লাভ করে তখন, যখন ধ্রুবেশ তার জীবনের বিনিময়ে কর্ণফুলির ডাকে সাড়া দিয়েছে। এই গল্পে রমা ও ধ্রুবেশের সংসারের পরিস্থিতি 'একটি নমস্কারে' উপন্যাসের কাব্যতীর্থ ও শুচির জীবনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জাপানীদের আক্রমণ ও তার কালোছায়া ঐ উপন্যাসেও দারুণভাবে প্রভাব ফেলেছে। যুদ্ধের পটভূমিতে জাপানী আক্রমণের এই রূপটি সমকালীন কথাসাহিত্য এমনকি বাংলা সাহিত্যেকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। আমার লেখা 'তিলাঞ্জলি থেকে কালকেতু: জীবনের অভিযাত্রা' অধ্যায়ে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লিখিত উপন্যাস আলোচনায় এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যুদ্ধকে ঘিরে ব্যক্তি হৃদয়ের অনুভূতির গল্প এটি। যদিও সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গল্পটির অনেকটা অংশ জুড়ে আছে।

আঠাশ বছরে (১৯৪০-৬৮) সুবোধ ঘোষের লেখা ১৫৭ টি ছোট গল্পের মধ্যে রয়েছে ভিন্নতা। তাঁর স্বাতন্ত্র্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্য স্বীকার্য। এর আগে মানুষের জীবনধারার সেই চিত্র আর কারো চোখে পড়েনি, আর চোখে পড়েনি বলেই ছোটনাগপুর-বিহার সীমান্তের খনির মানুষগুলি এমনভাবে কোন লেখায় ছবি হয়ে উঠতে পারেনি। সাধারণ মানুষের তুচ্ছ আচার আচরণ সুবোধ ঘোষের দৃষ্টিতে ভিন্নভাবে ধরা পড়ে বলেই বিমলের পুরনো ফোর্ড গাড়ীটিও মানবিক মর্যাদা লাভ করে। খনির শ্রমিকের চাপা পড়া দেহের লাল রক্ত দেখে হাজার হাজার বছর পরবর্তীকালের সাদা ফসিলের কল্পনা করেন। এমনকি আমাদের চিরচেনা মধ্যবিত্ত সমাজের আড়ালে মুখোশধারী চরিত্ররা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর গল্পে। চরিত্রের মধ্যবিত্ত অর্ন্তজীবনের কূটেষনা ও অর্ন্তগূঢ় জটিলতার বিশ্লেষণে সুবোধ ঘোষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেন। বাংলা সাহিত্যে কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের পাশাপাশি সুবোধ ঘোষ সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাদর্শ নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। জীবনকে তিনি যেভাবে দেখেছেন সেই গভীর এযনা থেকে ছোট গল্পগুলির সৃষ্টি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় তাঁর এই গল্পগুলির উপাদান শুধুমাত্র

একটি নোট হিসাবে ডায়েরীর পাতায় স্থান পেত, পরবর্তীকালে এক একটি গল্পে তা মহীরূহের জন্ম নিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন প্রবন্ধের আকারে তাঁর অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটিয়ে, পরবর্তীকালে তাকেই গল্পের রূপ দেন। তাঁর এই সমস্ত গল্পগুলির দ্বারা পরবর্তীকালের লেখক বিমল কর অনুপ্রাণিত হয়েছেন, প্রভাবিত হয়েছেন মহাশ্বেতা দেবীও। অনেক গল্প তাঁরা লিখেছেন সুবোধ ঘোষের দূরগামী ছায়ায় বসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি আনন্দবাজারের পৃষ্টপোষকতায় গল্প রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর গল্পের বিষয় ঐ নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বাস্তব জগতে যে অনায়াস বিচরণ তিনি করেছেন তারই ফলে তাঁর পাত্র পাত্রীদের তিনি তুলে আনতে পারেন অভ্রখনির গভীর থেকে, কখনো পতিতা পল্লী থেকে আবার কখনো বা শহুরে মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুম থেকে। জীবনকে তিনি বিশেষ কোন তত্ত্ব দ্বারা বিশ্লেষণ করেন না বলেই তাঁর জীবনদর্শন কোন খণ্ডাংশের মধ্যেই সীমায়িত নয়। জীবনে চলার পথের সূক্ষ্মতাকেও তিনি ধরতে চেয়েছেন, আর এখানেই সমকালীন অন্যান্য লেখকদের থেকে তিনি স্বতন্ত্র।

তথ্যসূত্র

১। 'রূপকথা'/শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/Ref. সাহিত্যে ছোটগল্প/নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়/প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ,/শ্রাবণ ১৪০৫।

২। 'ছোটগল্পের কথা'/ভূদেব চৌধুরী/পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি/জানু.২০০০, তৃতীয় মুদ্রণ।

৩। 'বোধন'/ছাড়পত্র/সুকান্ত সমগ্র/সারস্বত লাইব্রেরী/৩য় সং. শ্রাবণ ১৪১২।

৪। স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীদের ভূমিকা/শ্রী গোপীনাথ সেন/আদিবাসী কল্যাণ সমিতি পঃ বঃ।

৫। The Dust-Storm and the Hanging Mist.(A study of Birsa Munda and his movement in chhotonagpur. 1874-1901)/Suresh Singh/Firma K.L. Mukhopadhay/Calcutta - 1966.

৬। অরণ্যের অধিকার/মহাশ্বেতা দেবী/করুণা প্রকাশনী/১৩৮৪, বৈশাখ।

৭। প্রাগুক্ত।

৮। প্রাগুক্ত।

৯। 'কথা' কাব্যগ্রন্থ/রবীন্দ্ররচনাবলী/বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ/বৈশাখ ১৪০৯, পুর্নমুদ্রণ/৪র্থ খণ্ড।

১০। প্রাগুক্ত

১১। 'সবলা'/'মহুয়া' কাব্য/রবীন্দ্ররচনাবলী/অষ্টম খণ্ড/বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ/বৈশাখ ১৪০৯।

১২। প্রাগুক্ত।

১৩। কালের পুত্তলিকা/অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়/দে'জ/দ্বিতীয় সং. ১৯৯৯ নভেম্বর।

১৪। সুবোধ ঘোষ : 'বড় বিস্ময় জাগে'/উত্তম ঘোষ/আনন্দ পাবলিশার্স/১ম সং. ১৯৯৪।

১৫। 'সেদিনের আলোছায়া'/সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড/নাথ পাবলিশিং/প্রথম প্রকাশ জানু. ১৯৯৯।

১৬। 'মানে'/প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা/দে'জ/চতুর্থ মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯৪।

১৭। সেদিনের আলোছায়া/সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড/নাথ পাবলিশিং/প্রথম প্রকাশ জানু. ১৯৯৯।

১৮। ভরা থাক : সুবোধ ঘোষ স্মৃতি তর্পণ/জাতীয়তাবাদী লেখক/প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র/সুবোধ ঘোষ স্মৃতি সংসদ/আশ্বিন, ১৩৯৮।

এই অধ্যায়ে আলোচিত সুবোধ ঘোষের গল্প গ্রন্থ তালিকা :

১। 'ফসিল'/সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প/জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত/প্রকাশ ভবন/চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০১/পৃ. ২৪-৩৪।

২। 'গোত্রান্তর'/প্রাগুক্ত/পৃ. ৪৭-৫৮।

৩। 'সুন্দরম্'/প্রাগুক্ত/পৃ. ৩৫-৪৬।
৪। 'তিন অধ্যায়'/প্রাগুক্ত/পৃ. ২১২-২২৭।
৫। 'পরশুরামের কুঠার'/প্রাগুক্ত/পৃ. ৫৮-৬৮।
৬। 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ'/প্রাগুক্ত/পৃ. ২০০ - ২১১।
৭। 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'/গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স/সুবোধ ঘোষ/পৃ. ৮৬-৯৪।
৮। 'কোটেশন'/প্রাগুক্ত/পৃ. ১৭৯-১৮৯।
৯। 'উচলে চড়িনু'/সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প/জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত/প্রকাশ ভবন/চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০১/পৃ. ৯৪-১০৮।
১০। 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ'/প্রাগুক্ত/পৃ. ১৫২-১৬৫।
১১। 'স্নানযাত্রা'/সুবোধ ঘোষ গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স/পৃ. ১৯৭-২১১।
১২। 'বৈরনির্য্যাতন'/সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প/জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত/প্রকাশ ভবন/চতুর্থ সং. ১৪০১/পৃ. ১২০-১৩২।
১৩। 'শ্মশানচাঁপা'/গল্পসমগ্র, ১ম খণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স/সুবোধ ঘোষ/পৃ. ৪২-৫৫।
১৪। 'শক থেরাপি'/সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র ৫ম খণ্ড/নাথ পাবলিশিং/প্রথম প্রকাশ ২০০১ এপ্রিল/পৃ. ৩২১-৩৩২।
১৫। 'জতুগৃহ'/সুবোধ ঘোষের প্রেমের গল্প/সুবোধ ঘোষ/সাহিত্যম্/প্রথম প্রকাশ-কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৯৬/পৃ. ১৯৯-২১৬।
১৬। 'শুক্লাভিসার'/গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স/সুবোধ ঘোষ/পৃ. ৫৯-৬৭।
১৭। 'থিরবিজুরি'/সুবোধ ঘোষের প্রেমের গল্প/সুবোধ ঘোষ/সাহিত্যম্/প্রথম প্রকাশ-কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৯৬/পৃ. ৩০৯-৩২৭।
১৮। 'চোখ গেল'/প্রাগুক্ত/পৃ. ২৮১-৩০২।
১৯। 'ঠগিনী'/গল্পসমগ্র, ১ম খণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স/সুবোধ ঘোষ/পৃ. ২৫৫-২৬৪।
২০। 'সবলা'/গল্পসমগ্র, ২য় খণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স/সুবোধ ঘোষ/পৃ. ১৭২-১৭৯।
২১। 'দুঃসহধর্মিণী/সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র, ৫ম খণ্ড/নাথ পাবলিশিং/প্রথম প্রকাশ, ২০০১ এপ্রিল/পৃ. ৩৪১-৩৫৯।
২২। 'চিত্তচকোর'/সুবোধ ঘোষের প্রেমের গল্প/সুবোধ ঘোষ/সাহিত্যম্/প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা -১৯৯৬/পৃ. ৩৫৫-৩৬৮।
২৩। 'ভোরের মালতি'/গল্পসমগ্র, ২য় খণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স/সুবোধ ঘোষ/পৃ. ২১১-২২২।

২৪। 'বৈদেহী'/গল্পসমগ্র, ১ম খণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স/সুবোধ ঘোষ/পৃ. ১১৩-১২৯।

২৫। 'অর্কিড'/প্রাগুক্ত/পৃ. ১৪২-১৫১।

২৬। 'কাগজের নৌকা'/জীবন-বিচিত্রা/সুবোধ ঘোষ/পৃ. ৪৫-৫১।

২৭। 'অঙ্গদা'/সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড/নাথ পাবলিশিং/প্রথম প্রকাশ-জানু. ২০০০/পৃ. ২৪৩-২৫০।

২৮। 'ক্যাকটাস'/সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র, ৩য় খণ্ড/নাথ পাবলিশিং/প্রথম প্রকাশ জানু. ১৯৯৯/পৃ. ৪৮৫-৪৯০।

২৯। 'হরেণবাবুর হরিণী মেয়ে'/জীবন-বিচিত্রা/সুবোধ ঘোষ/প্রথম প্রকাশ জানু. ১৯৯৭, কলকাতা পুস্তক মেলা/পৃ. ১৮৪-১৯৫।

৩০। 'অযান্ত্রিক'/সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প/প্রকাশ ভবন/চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪০১/পৃ. ১৬-২৩।

৩১। 'ভাট তিলক রায়'/প্রাগুক্ত/পৃ. ১০৮-১১৯।

৩২। 'অলীক'/গল্প সমগ্র, ১ম খণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স/পৃ. ৯-৩০।

৩৩। 'মিছার মা'/গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স/সুবোধ ঘোষ/পৃ. ২০৫-২১৮।

৩৪। 'কতটুকু ক্ষতি'/সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড/নাথ পাবলিশিং/জানু. ২০০০/পৃ. ৩২৭-৩৩১।

৩৫। 'চর্তুভুজ ক্লাব'/গল্পসমগ্র, ১ম খণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স/সুবোধ ঘোষ/পৃ. ২৮২ - ২৯৭।

৩৬। 'তমসাবৃতা'/গল্পসমগ্র, ২য় খণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স/সুবোধ ঘোষ/পৃ. ১৬২-১৭২।

৩৭। 'গরল অমিয় ভেল'/সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প/প্রকাশভবন/চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪০১/পৃ. ৮১-৯৩।

৩৮। 'বারবধূ'/প্রাগুক্ত/পৃ. ১৪০-১৫২।

৩৯। 'কৌন্তেয়'/সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড/নাথ পাবলিশিং/প্রথম প্রকাশ জানু. ২০০০/পৃ. ২৭৪-২৮১।

৪০। 'মা হিংসী'/সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প/প্রকাশ ভবন/চতুর্থ সং. ১৪০১/পৃ. ১৬৬-১৮০।

৪১। 'দণ্ডমুণ্ড'/গল্পসমগ্র, ২য় খণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স/সুবোধ ঘোষ/পৃ. ১০০-১১১।

৪২। 'আত্মজা'/গল্পসমগ্র, ৩য় খণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স/সুবোধ ঘোষ/পৃ. ১৭৯-১৯১।

৪৩। 'নতুন শালিক'/প্রাগুক্ত/পৃ. ৯৬-১০১।

৪৪। 'শিবালয়'/সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প/প্রকাশ ভবন/চতুর্থ সং. ১৪০১/পৃ. ১৮০-২০০।

৪৫। 'কালাগুরু'/প্রাগুক্ত/পৃ. ১৩২-১৩৯।

৪৬। 'কর্ণফুলির ডাক'/সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র/২য় খণ্ড/নাথ পাবলিশিং/প্রথম প্রকাশ জানু. ১৯৯৯/পৃ. ৩৯৮-৪০৭।

অন্যান্য আলোচ্য ও সহায়ক গ্রন্থ তালিকা :

ক। 'অমৃতপথযাত্রী'/সুবোধ ঘোষ/সুবর্ণা প্রকাশনী/১ম সং - ১৯৯৯, সেপ্টেম্বর।

খ। 'ভরা থাক', সুবোধ ঘোষ স্মৃতি - তর্পণ/সুবোধ ঘোষ স্মৃতি সংসদ।

গ। 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা'/শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়/শ্রেষ্ঠ গল্প/করুণা প্রকাশনী/প্রথম প্রকাশ মে ২০০২।

ঘ। 'নারীমেধ'/প্রাগুক্ত।

ঙ। 'বরফ সাহেবের মেয়ে'/বিমল কর পঞ্চাশটি গল্প/আনন্দ পাবলিশার্স/তৃতীয় মুদ্রণ ২০০১।

চ। 'স্তনদায়িনী'/মহাশ্বেতা দেবী/বাছাই গল্প/মণ্ডল বুক হাউস/প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯।

ছ। সাপ/প্রেমেন্দ্র মিত্র/নির্বাচিতা/এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সনস্ প্রাই.লি./৩য় সং. ১৪০১।

জ। স্টোভ/প্রাগুক্ত।

ঝ। খুনী বউ/রমাপদ চৌধুরী/গল্প সমগ্র/আনন্দ পাবলিশার্স/পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ - ডিসেম্বর ১৯৭৮।